২০০১

পাক্ষিক

# আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৩ বর্ষ ❑ ২২তম সংখ্যা

৩১ মে, ২০০১ ইসাব্দ

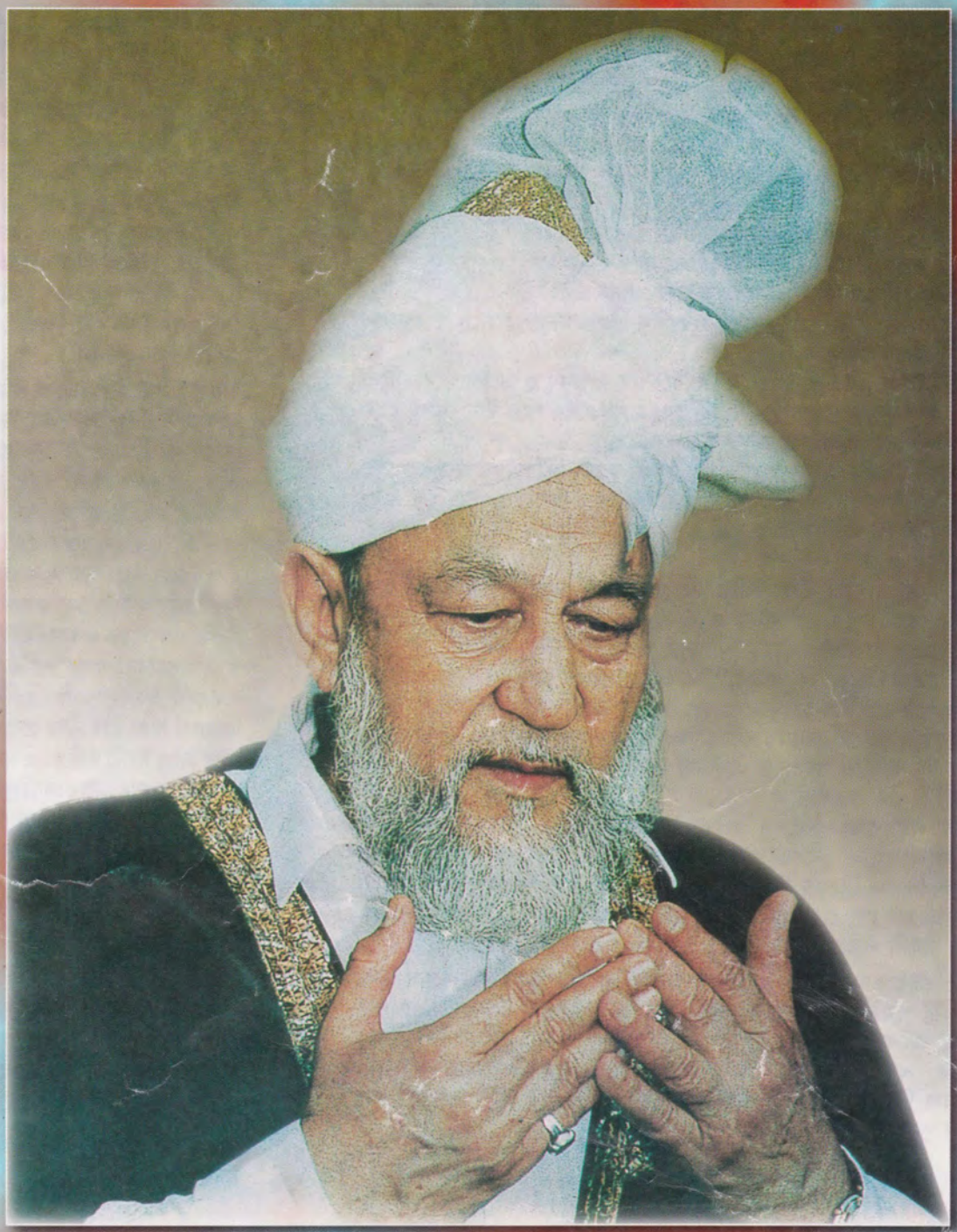

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# আপনার সন্ধানে আছি!

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ,
খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

১. আপনি কি পরিশ্রম করতে জানেন? এইরূপ পরিশ্রম যে, তের-চৌদ্দ ঘণ্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করতে পারেন?

২. আপনি কি সত্য কথা বলতে জানেন; এইরূপ সত্য কথা যে কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমন কি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করে না এবং কেউ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কেচ্ছা শুনালে আপনি তার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না?

৩. আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হতে মুক্ত? মহল্লার গলি ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়াতে পারেন? বাজারে উচ্চস্বরে সর্বপ্রকার ঘোষণা করতে পারেন? সমস্ত দিন চলতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকতে পারেন?

৪. আপনি ই'তেকাফ করতে পারেন? এইরূপ ই'তেকাফ যে–
ক) এক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন থাকতে পারেন;
খ) ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তসবীহ করতে পারেন এবং
গ) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকতে পারেন।

৫. আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারীগণ পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাগণের মধ্যে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোঝা বহন করে একা কপর্দকহীনভাবে সফর করতে পারেন?

৬. কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের ঊর্ধ্বে থাকে, তারা পরাজয়ের নামও শুনতে পসন্দ করে না। তারা পাহাড়-পর্বত কাটতে তৎপর হয় এবং নদীগুলোকে টেনে আনতে উদ্যত হয়ে পড়ে। আপনি কি এ রকম কাজ করতে সদা প্রস্তুত?

৭. আপনার এইরূপ মনোবল আছে কি যে, সমস্ত জগৎ বলবে ভুল– আর আপনি বলবেন শুদ্ধ। চারদিক হতে লোকেরা ঠাট্টা করবে কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করে বলবে : 'দাঁড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করবো'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুত ধাবমান হওয়ার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আপনি মাথা পেতে বলবেন : 'এসো প্রহার কর'। আপনি তাদের কারো কথা মানবেন না। কেননা, তারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য করবেন। কেননা, আপনি সত্যবাদী।

৮. আপনি এই কথা বলবেন না যে, আপনি পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু খোদাতাআলা আপনাকে অকৃতকার্য করেছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজের দোষের ফলশ্রুতি বলে মনে করুন। আপনি ইহা বিশ্বাস করেন যে, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়। যে কৃতকার্য হয় নি, সে আদৌ পরিশ্রম করে নি।

আপনি যদি এইরূপ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একজন উত্তম মোবাল্লেগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার বান্দা অনেক দিন হতে আপনার অনুসন্ধান করছেন। হে আহমদী যুবক! সেই ব্যক্তির সন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে, অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা, ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হতে চলেছে, রক্ত সিঞ্চনে উহা পুনরায় সজীব হবে।

## সাম্প্রতিক দিক-নির্দেশনা

মাহে রবিউল আউয়ালের মধ্য দিকে আমরা অতিক্রম করছি। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এ মাসে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরলোক গমনও করেন। হযরত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আমাদের নবী-খাতামান্নবীঈন এবং আমাদের জন্যে পরম ও সুন্দরতম আদর্শ। তাই অন্যান্য মাসে তো বটেই বিশেষ করে এ মাসে প্রত্যেক জামাতে বেশি বেশি করে এমনকি হালকায় হালকায় আর সম্ভব হলে প্রত্যেক বাড়ীতে সীরাতুন্ নবী (সঃ)-এর জলসার আয়োজন করে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবনাদর্শ সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা উচিত। এতে বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের লোকদেরকে দাওয়াত দেয়া আবশ্যক। এমন কি নবী করীম (সঃ) সম্বন্ধে তাদের মতামত জানার জন্যে তাদেরকেও আলোচনা করার সুযোগ দেয়া উচিত।

ব্যক্তিগতভাবে আমরা প্রত্যেকে যেন নবী করীম (সঃ)-এর বিরাট জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধেও পড়াশুনা করি ও অন্যদেরকেও পড়াশুনা করতে উৎসাহ দান করি। আল্লাহ্তাআলা আমাদেরকে এর সৌভাগ্য দান করুন।

আগামী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আমাদের জাতীয় মজলিসে শূরা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ শূরায় যারা সদস্য তাদের জন্যে এতে যোগদান করা তাদের নৈতিক ও ঈমানী দায়িত্ব। সুতরাং বিনা ব্যতিক্রমে প্রত্যেক জামাত থেকে এতে যোগদান করার জন্যে চেষ্টা করা প্রয়োজন। যারা বিশেষ কারণে যোগ দিতে পারবেন না তাদের লিখিতভাবে অনুমতি নেয়া প্রয়োজন। যারা এরপরও অনুপস্থিত থাকবেন তারা শাস্তি যোগ্য অপরাধ করবেন। এ শূরা পার্থিব কোন পার্লামেন্ট বা সমাবেশ নয়। এর নির্ধারিত কতগুলো পবিত্র রীতি-নীতি রয়েছে সেগুলো মেনে চলাও ঈমানী দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে বিগত কয়েকটি সংখ্যায় মোহতরম চৌধুরী হামীদুল্লাহ্ সাহেব, ওকীলে আলী তাহরীকে জাদীদ সংকলিত 'আহমদী জামাতে শূরার ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে। এর মধ্যে শূরার রীতি-নীতি ও নিয়ম-কানুন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং এটা পাঠ করা ও তদনুযায়ী আমল করা সংশ্লিষ্ট সকলের কর্তব্য

শূরার কাজ যাতে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সেজন্যে সকলের পূর্ণ সহযোগিতা ও দোয়া কাম্য। আল্লাহ্তাআলা সকলকে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করার তৌফীক দান করুন, আমীন।

**আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী**
ন্যাশনাল আমীর

পাক্ষিক
# আহমদী

নব পর্যায় ৬৩ বর্ষ ॥ ২২তম সংখ্যা

১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮ বঙ্গাব্দ ৭ রবিউল আউয়াল ১৪২২ হিঃ কাঃ
৩১ হিজরত ১৩৮০-হিঃ শাঃ ৩১ মে ২০০১ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ❑ ভারত টাঃ ২০০ ❑ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

**সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি**
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

**ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক**
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

**নির্বাহী সম্পাদক**
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

**বার্তা সম্পাদক**
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

**প্রচার সম্পাদক**
মোঃ আবুল কালাম আজাদ

**শিল্প নির্দেশক**
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

**সহকারী শিল্প নির্দেশক**
সালাহউদ্দীন আহমদ

**বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি**
আব্দুল আউয়াল ইমরান

**হিসাব ব্যবস্থাপক**
গিয়াসুদ্দীন আহমদ

**বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা**
এ. কে. রেজাউল করীম

**বিদেশ প্রতিনিধি**

| | | |
|---|---|---|
| মুহাম্মদ আব্দুল হাদী | – | লন্ডন, ইউ কে |
| ইসমত পাশা | – | কানাডা |
| মোহাম্মদ খলিলুর রহমান | – | নিউ ইয়র্ক |
| মইন উদ্দীন সিরাজী | – | ক্যালিফর্নিয়া |
| আজিজ আহমদ চৌধুরী | – | জার্মানী |
| কাউসার আহমদ | – | হল্যান্ড |
| এন, এ, শামীম আহমদ | – | বেলজিয়াম |
| ইসমত উল্লাহ্ | – | জাপান |
| ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ | – | নিউজিল্যান্ড |
| ফকির আব্দুস সাত্তার | – | সিঙ্গাপুর |

**তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশনস্**

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৭৩০০৮০৮, ৭৩০০৮৪৯, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৭৩০০৯২৫

*সম্পাদকীয়*

## মজলিসে মুশাভিরাত

মজলিসে মুশাভিরাত-পরামর্শ সভা ইসলামের বৈশিষ্ট্যাবলীর অন্যতম। ইহা নবুওয়ত এবং এর অবর্তমানে খেলাফতের সাথেই সংশ্লিষ্ট। মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্তাআলার নির্দেশ মোতাবেক (সূরাতু আলে ইমরানঃ ১৬০ আয়াত ও সূরাতুশ্ শূরা ঃ ৩৯ আয়াত) মু'মিন সমাজের সাথে পরামর্শের মাধ্যমে যে কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক (রাঃ) মজলিসে শূরাকে আনুষ্ঠানিকভাবে কাঠামোগত রূপ দান করেন। শূরার গুরুত্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি (রাঃ) বর্ণনা করেছেন- **লা খিলাফাতা ইল্লা 'আন্ মাশওয়ারাতিন** অর্থাৎ পরামর্শ ব্যতিরেকে খেলাফত হতে পারে না। ইহা খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ পর্যন্ত সত্যিকার অর্থে কার্যকরী ছিল। মজলিসে শূরার মাধ্যমে খলীফার প্রতি ন্যস্ত আমানতের দায়িত্ব পালনে মু'মিন সমাজও অংশীদার হয়।

মজলিসে শূরা তথাকথিত কোন আইন সভা বা পার্লামেন্ট নয়। এখানে কোন বিরোধী দল বা ওয়াক আউট নেই। এখানে খলীফা কর্তৃক পরামর্শ চাওয়া হয়। স্বেচ্ছায় পরামর্শ দেয়ার সুযোগ এখানে গৌণ। মু'মিন সমাজ এক দেহ এক মন হয়ে নেযামের আহ্বানে নির্ধারিত বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এখানে কূট-সমালোচনা বা বিরোধিতার অবকাশ নেই। ব্যক্তি-স্বার্থকে পিছনে ফেলে এখানে সামগ্রিক উন্নতি এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়া হয়। এখানে আছে অতীতের পর্যালোচনা, বর্তমানের জন্যে দোয়া এবং ভবিষ্যতের জন্যে সুষ্ঠু পরিকল্পনা। তাকওয়া ও খোদা-ভীতিকেই এখানে প্রাধান্য দেয়া হয়। বড়ই আশ্চর্য লাগে যখন দেখি খেলাফত ছাড়াও কোন কোন দল বা গোষ্ঠি মজলিসে শূরা করে থাকেন ও এটাকে পার্লামেন্টের স্থলাভিষিক্ত মনে করে থাকেন; অথচ মজলিসে শূরা খেলাফতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ আর খেলাফত ব্যতিরেকে কোন মজলিসে শূরা হতেই পারে না।

হযরত উমর (রাঃ)-এর ন্যায় ইসলামের দ্বিতীয় পর্যায়ে আহমদীয়া জামাতের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ফযলে উমর মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ আল্ মুসলেহুল মাওউদ (রাঃ) ১৯২২ খৃষ্টাব্দে রীতিমত মজলিসে শূরার প্রবর্তন করেন। তখন থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই মজলিসে শূরা কার্যকরী রয়েছে যা আহমদীয়তের সত্যতার উজ্জ্বল নিদর্শনরূপে প্রতীয়মান। প্রতিচ্ছায়ারূপে দেশে দেশে জাতীয় পর্যায়েও এই মজলিস দীর্ঘ সময় ধরে কার্যকরী রয়েছে। প্রয়োজনে জাতীয় আমীরের আহ্বানে এই মজলিস তাঁকে পরামর্শ দিয়ে থাকে। খলীফায়ে ওয়াক্ত আল্লাহ্র প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে কুরআন এবং সুন্নাহ্র উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তাই সর্বদা শূরার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করতে তিনি বাধ্য নন, মু'মিন সমাজের কল্যাণের তাগিদে তিনি তা নাকচ করারও ক্ষমতা রাখেন। পরবর্তীকালে খলীফায়ে-ওয়াক্তের এ পদক্ষেপ মু'মিন সমাজের জন্যে সুফলদায়ক বলে সাব্যস্ত হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে এর বহু প্রমাণ রয়েছে।

আমরা মজলিসে মুশাভিরাতের সর্বাঙ্গীণ সুফল এবং স্থায়ীত্ব কামনা করি এবং দোয়া করি যেন আল্লাহ্তাআলা গোটা দুনিয়ার মানব সমাজকে মজলিসে শূরার পদ্ধতি উপলব্ধি ও অবলম্বন করার এবং এথেকে উপকৃত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন। বলা বাহুল্য, এতে বর্তমান বিশ্ব একনায়কতন্ত্র, স্বৈরাচার ও গণতন্ত্রের লাগামহীন কুফল থেকে রক্ষা পেতে পারে।

**- নির্বাহী সম্পাদক**

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃঃ |
|---|---|---|
| ❑ কুরআন মাজীদ ঃ সূরাতুল আহযাব-২৪ | ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে | ৩ |
| ❑ হাদীস ঃ নবী করীম (সঃ)-এর বৈশিষ্ট্যাবলী | ঃ সংকলন ও অনুবাদ- মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ | ৩-৪ |
| ❑ অমৃত বাণী ঃ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ)ঃ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর দৃষ্টিতে | ঃ সংকলন ও অনুবাদ -জনাব শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান | ৪ ও ২১ |
| ❑ জুমুআর খুতবা ঃ রহীম গুণের বিস্তারিত বর্ণনা- হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ) | ঃ অনুবাদ-মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী | ৫-১০ |
| ❑ কবিতা - না'তে রসূল (সঃ) | ঃ জনাব শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান | ১১ |
| ❑ হোমিও প্যাথিক – সদৃশ্য বিধান ঃ হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) | ঃ অনুবাদ- মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী | ১২-১৩ |
| ❑ আমাদের চাঁদা | ঃ জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান | ১৩-১৫ |
| ❑ আমার জীবন ঃ মূল - শেঠ আব্দুল্লাহ্ আলাদীন | ঃ অনুবাদ - মৌঃ আবূ মোহাম্মদ সাহাবুদ্দীন | ১৬-১৭ |
| ❑ আহমদী জামাতে শূরার ব্যবস্থাপনা<br>সংকলন - মোহতরম চৌধুরী হামীদুল্লাহ্, ওকীলে আলা, তাহরীকে জাদীদ | ঃ অনুবাদ- জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান | ১৮-২১ |
| ❑ আমি না আপনি | ঃ জনাব ফজলে-ই-ইলাহী | ২২-২৩ |
| ❑ ছোটদের পাতা ঃ মিনহাজুত্তালেবীন (সত্য সাধকদের রাজপথ)<br>মূল ঃ হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) | ঃ পরিচালক - জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান | ২৪-২৫ |
| ❑ নতুনদের পাতা ঃ | | |
| খেলাফতের আনুগত্য | ঃ সংকলন ও অনুবাদ - জনাব কাওসার আলী মোল্লা | ২৬ |
| সুন্দর বনে সাত দিন | ঃ আলহাজ্জ মোশাররফ হোসেন মোল্লা | ২৭-২৯ |
| সমাজ ব্যবস্থাপনায় হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর অবদান | ঃ মৌঃ মোহাম্মদ মজিদুল ইসলাম | ৩০-৩১ |
| সরাইলের আহমদীয়া জামাত ঃ আমার কিছু কথা | ঃ জনাব ওয়াহিদ হোসেন রাধন | ৩১-৩২ |


প্রচ্ছদ ঃ নিখিল বিশ্ব আহমদী জামাতের বর্তমান ইমাম ও চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)-কে দোয়ারত দেখা যাচ্ছে।

## শোক সংবাদ

### ডঃ বিলি গ্রাহামকে চ্যালেঞ্জ দাতা
### মোহতরম মাওলানা শেখ মোবারক আহমদ সাহেব আর নেই

সিলসিলা আলীয়া আহমদীয়ার নির্ভীক ও নিঃস্বার্থ কর্মী ও বুযূর্গ মুরব্বী মোহতরম মাওলানা শেখ মোবারক আহমদ সাহেব গত ৯মে, ২০০১ রোজ বুধবার আমেরিকায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে ...রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৯০ বছর। ওয়াশিংটনে তাঁর নামাযে জানাযা পড়ান মোহরতম সাইয়্যেদ শামসাদ আহমদ নাসের সাহেব মুরব্বী সিলসিলাহ্। কানাডা ও লন্ডন থেকে বন্ধুগণ এসে এতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি মুসী ছিলেন তাই তাঁর কফিন রাবওয়ার বেহেশ্‌তি মকবেরায় দাফন করার জন্যে পাঠানো হয়। জামাতে দীর্ঘ ৭৫ বছরের সেবা দানকারী এ বুযূর্গকে ১৪ই মে বেহেশ্‌তি মকবেরায় সমাধিস্থ করা হয়।

উল্লেখ, ষাটের দশকে তিনি আফ্রিকার খৃষ্টান প্রেসিডেন্ট মিশনারী ডঃ বিলি গ্রাহামকে দোয়ার যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন কিন্তু ডঃ গ্রাহাম তা গ্রহণ করেন নি। এ বুযূর্গ বাংলাদেশেও কয়েকবার এসেছিলেন।

আমরা তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছি। আল্লাহ্‌তাআলা যেন তাঁর বিশাল খেদমতকে কবুল করেন ও তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মকাম দান করেন। তাঁর পরিবারকে যেন সাব্‌রে জামীল দান করেন ও তাঁর পুণ্য কর্ম যেন তাঁর পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সঞ্জীবিত রাখেন, আমীন। (সূত্র ঃ আল্ ফযল ১৬-৫-২০০১)

- আহমদী বার্তা

## এ বছর আন্তর্জাতিক সালানা জলসা জার্মানীতে অনুষ্ঠিত হবে

এডিশনাল ওয়াফিলুত্ তবশীর একটি সার্কুলারে জানিয়েছেন, অনবরত গরুর খুরারোগ বৃদ্ধির কারণে যুক্তরাজ্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি না দেয়ার প্রেক্ষিতে টিলফোর্ড এলাকায় যুক্তরাজ্যের এ বছরের সালানা জলসা করতে অপারগতা জানিয়েছেন যুক্তরাজ্য জামাতের আমীর সাহেব।

এতদাবস্থাদৃষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) দয়া পরবশ হয়ে জার্মানী জামাতের আমীর সাহেবের অনুরোধ রক্ষা করেছেন। ফলে এ বছর আন্তর্জাতিক সালানা জলসা জার্মানীর মেনহেইমে ২৪-২৬ আগস্ট, ২০০১ তারিখ অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাল্লাহ্। এ প্রসঙ্গে জার্মানী জামাত থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যথাসময়ে সরবরাহ করা হবে। এ আন্তর্জাতিক সালানা জলসায়- বর্তমান শতাব্দী তথা নতুন সহস্রাব্দের প্রথম সালানা জলসায় যাঁরা যোগদান করতে চান তারা এখন থেকেই প্রস্তুতি নিন এবং জলসার সার্বিক সফলতার জন্যে দোয়া করতে থাকুন।

- আহমদী বার্তা

## কুরআন মাজীদ

### সূরাতুল আহ্যাব - ৩৩

### উৎকৃষ্টতম আদর্শ মুহাম্মদ (সঃ)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

অর্থ ঃ নিশ্চয় তোমাদের জন্যে আল্লাহ্‌র রসূলের মধ্যে উৎকৃষ্টতম আদর্শ রয়েছে তার জন্যে যে আল্লাহ্ ও পরকালের আশা রাখে আর আল্লাহ্‌কে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।

ব্যাখা ঃ নবী করীম (সঃ)-এর জীবনে অন্তহীন পরীক্ষার মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠিন ও কঠোর পরীক্ষা ছিল খন্দকের যুদ্ধ। এই কঠোরতম পরীক্ষা হতে সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হওয়ার ফলে, তাঁর নৈতিক স্তর ও আধ্যাত্মিক মর্যাদা বহুগুণে বেড়ে গেল। মানুষের মনের প্রকৃত পরিচয়, তার মাহাত্ম্য বা নীচতা, তখনই সঠিকভাবে প্রকাশিত হয় যখন সে মহাবিপদে বা ঘোর অন্ধকারে নিপতিত হয় বা যখন সে নিজের শত্রুকে স্বীয় পদতলে ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় দেখে কৃতকার্যতা ও বিজয়ের গৌরব অর্জন করে। ইতিহাস এ কথার ভূরি ভূরি সাক্ষ্য-প্রমাণে ভরপুর যে, মহানবী (সঃ) স্বীয় সংকট মুহূর্তে যেমন মহান ও মহীয়ান ছিলেন, স্বীয় কৃতকার্যতা ও বিজয় মুহূর্তেও তেমনি মহান ও মহীয়ান ছিলেন। খন্দকের যুদ্ধ, উহুদের যুদ্ধ ও হুনায়নের যুদ্ধ তাঁর সুমহান চরিত্রের এক বিশিষ্ট দিকে যেমন ব্যাপকভাবে আলোকসম্পাত করে, তেমনি মক্কা বিজয় তাঁর চরিত্রের অন্য বিশিষ্ট দিকের প্রতি ব্যাপকভাবে আলোকসম্পাত করে। সম্পদে-বিপদে, জয়-পরাজয়ে তিনি সমভাবে মহান ও মহীয়ান। সংকট ও বিপদ তাঁকে হতাশ বা মুহ্যমান করে নি, আবার কৃতকার্য ও বিজয় তাঁকে গর্বিত করে নি। হুনায়নের যুদ্ধের দিনে যখন তিনি প্রায় একাকী রণাঙ্গণে ছিলেন এবং ইসলামের অস্তিত্ব প্রায় মিটে যাবার মত হ'ল তখনও তিনি নির্ভয়ে নির্দ্বিধায় শত্রুব্যূহে একা প্রবেশ করলেন, আর তাঁর পবিত্র মুখে বীরত্বভরে উচ্চারিত হল- 'আমি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নবী, আমি মিথ্যা বলছি না। আমি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র।' আর যেদিন মক্কা বিজয়ের সাথে, সারা আরব ভূমি তাঁর পদতলে প্রণত হল, তখন অবিসংবাদিত সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তিনি গর্বিত ও উদ্ধত হলেন না। তিনি শত্রুর প্রতি ক্ষমা ও মাহাত্ম্য প্রদর্শন করলেন।

মহানবী (সঃ)-এর চরিত্র-মাহাত্ম্যের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল সাক্ষ্য ইহাই যে, যারা তাঁর নিত্য সাথী ছিলেন ও তাঁকে সর্বাপেক্ষা বেশী ঘনিষ্ঠভাবে চিনতেন তারা প্রত্যেকেই বিনা বাক্য ব্যয়ে তাঁর দাবীর সাথে সাথে তাঁকে সত্য নবী বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা হলেন, মহানবী (সঃ)-এর স্ত্রী হযরত খদীজা (রাঃ), তাঁর জীবনব্যাপী বন্ধু হযরত আবূ বকর (রাঃ),তাঁর চাচাত ভাই হযরত আলী (রাঃ) এবং তাঁর মুক্তিপ্রাপ্ত কৃতদাস হযরত যায়েদ (রাঃ)। মহানবী (সঃ) ছিলেন উচ্চতম মানবতার প্রতীক। তিনি (সঃ) ছিলেন সুন্দরের, কল্যাণের ও পরহিতের মহোত্তম আদর্শ। তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবনের ও মহান চরিত্রের যে কোন দিকে তাকিয়ে দেখুন, তিনি অনুপম। তিনি মানবতার জন্য অতুলনীয় দৃষ্টান্ত ও আদর্শ। তিনি সর্বাধিক অনুসরণযোগ্য। তাঁর জীবন প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত উন্মুক্ত ইতিহাসের মত পাতায় পাতায় বর্ণিত। তিনি এক পিতামাতাহীন বালক হিসাবে জীবন আরম্ভ করেন এবং সমগ্র জাতির ভাগ্য-নিয়ন্তা হিসাবে জীবন সমাপ্ত করেন। বালক বয়সে তিনি ছিলেন শান্ত, গম্ভীর ও মর্যাদাবান। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি ছিলেন নীতিবান, চারিত্রিক গুণাবলীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ, ন্যায় ও গাম্ভীর্যের মূর্ত প্রতীক। মধ্য বয়সে তিনি হলেন তাদের সকলের কাছে 'আল্ আমীন', 'আস্ সুদুক' (বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী)। ব্যবসায়ী হিসাবে তিনি ছিলেন বিবেক-বিবেচনা ও সততার শীর্ষে। তিনি অধিক বয়স্কা ও অল্প বয়স্কার পাণি গ্রহণ করলেন এবং তাঁরা সকলেই শপথপূর্বক তাঁর বিশ্বস্ততা, ভালবাসা, পবিত্রতা ও মহত্ত্বের সাক্ষ্য দান করলেন। পিতা হিসাবে তিনি ছিলেন অতিশয় স্নেহশীল, বন্ধু হিসাবে ছিলেন বিশ্বস্ত ও বিবেচনাশীল। একটি অধঃপতিত পাপাচারী সমাজের সংস্কারের কঠিন গুরুদায়িত্বের বোঝা যখন তাঁর কাঁধে চাপল এবং এ কারণে অত্যাচারিত ও নির্বাসিত হলেন, তখন তিনি মোটেও দমিলেন না, বরং অত্যন্ত ধৈর্য-স্থৈর্য ও মর্যাদার সাথে তা বরণ করে নিলেন। তিনি সাধারণ সৈন্যরূপে যুদ্ধ করেছেন, আবার বড় বড় সেনাবাহিনীকে পরিচালনাও করেছেন। তিনি পরাজয় বরণ করেছেন, বিজয়ীও হয়েছেন। তিনি আইন প্রণয়ন করেছেন, আবার বিচারকের কাজও করেছেন। তিনি ছিলেন একাধারে রাষ্ট্রনীতিবিদ্ শিক্ষাদাতা ও মানুষের নেতা। "রাষ্ট্রপতি ও ধর্মাধিপতিরূপে তিনি ছিলেন একাধারে সীজার ও পোপ। কিন্তু তিনি পোপ হওয়া সত্ত্বেও পোপের ভূষণ-ভড়ং কিছুই তার ছিল না। তিনি সীজার ছিলেন বটে, কিন্তু সীজারের রাজদণ্ড তার ছিল না। নিয়মিত সেনাবাহিনী ছাড়া, নিয়মিত দেহ-রক্ষী ছাড়া, নিয়মিত রাজস্ব ও রাজ প্রাসাদ ছাড়া যদি কোন মানুষের একথা বলবার অধিকার থাকে যে, তিনি ঐশী অধিকার বলে শাসন করেছেন, তবে সে অধিকার একমাত্র মুহম্মদ -এরই রয়েছে। কেননা, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, যদিও ক্ষমতা প্রয়োগের সকল যন্ত্র ও ব্যবস্থা তার মোটেই ছিল না। তিনি নিজ হাতে গৃহকর্ম করতেন, চামড়ার মাদুরে শয়ন করতেন। দৈনিক কয়েকটি খেজুর কিংবা বার্লি-রুটি মাত্র পানিসহ খেতেন। সারাদিনব্যাপী নানাবিধ কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের পর, রাত্রির প্রহরগুলি তিনি দোয়া ও প্রার্থনায় কাটিয়ে দিতেন। এমনকি, দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময়ব্যাপী দোয়া করতে করতে তার পায়ের পাতা ফুলে যেত। বিশ্বে এমন কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই যিনি এতসব পরিবর্তিত অবস্থা ও অবস্থানের ভিতর দিয়ে-জীবন কাটিয়েছেন অথচ নিজে সামান্য পরিবর্তিত হন নি" (মুহাম্মদ এন্ড মুহাম্মাদিজম ঃ বসওয়ার্থ স্মীথ)।

## হাদীস শরীফ

### নবী করীম (সঃ)-এর বৈশিষ্ট্যাবলী

১। হযরত নবী করীম (সঃ) বলেন, আমি মানবীয় চারিত্রিক গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশের জন্যে আবির্ভূত হয়েছি।

২। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, নবী করীম (সঃ)-এর চরিত্র ছিল কুরআন (মুসলিম)।

৩। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, ছয়টি বিষয়ে আমাকে অপরাপর নবীগণের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে ঃ

(১) সার্বিক তত্ত্বপূর্ণ বাণীসমূহ আমাকে দেওয়া হয়েছে, (২) প্রতাপ ও প্রভাব শক্তি দ্বারা আমি সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছি, (৩) আমার জন্যে গনিমতের মাল হালাল করা হয়েছে, (৪) সমগ্র পৃথিবী আমার জন্যে মসজিদস্বরূপ ও পবিত্র করা হয়েছে, (৫) সমগ্র মানবকুলের প্রতি আমি প্রেরিত হয়েছি, (৬) আমাকে নবীগণের খাতাম (মোহর) করা হয়েছে (মুসলিম)।

৪। আমি আল্লাহ্‌তাআলার নিকট তখন হতেই 'খাতামান্নাবীয়ীন' ছিলাম যখন হযরত আদম (আঃ) পানি ও কাদা মিশ্রিত অবস্থায় ছিলেন (মুসনাদ আহমদ, কনযূল উম্মাল)।

৫। হযরত ইবনে আব্বাস (সঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূলে করীম (সঃ) সমগ্র মানবের মধ্যে সবচে' বেশি দানশীল ছিলেন। যখন রমযান মাসে জিব্‌রাঈল কুরআন শরীফ পুনরাবৃত্তির জন্য তাঁর নিকট আসতেন তখন তিনি পূর্বাপেক্ষাও অধিক দানশীলতার পরিচয় দিতেন বরং ইহা বলা চলে যে, তিনি কল্যাণ ও দানশীলতায় মুষলধারা বৃষ্টি ও উহার মধ্যকার প্রবল হাওয়া অপেক্ষাও প্রবলতর ছিলেন (বুখারী)।

অনুবাদ ও সংকলন ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্

## অমৃতবাণী

# হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ঃ যুগ-ইমাম হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর দৃষ্টিতে

"আমি সর্বদা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি, এই যে আরবী নবী যাঁর নাম 'মুহাম্মদ' (তাঁর প্রতি হাজার হাজার দুরূদ ও সালাম), তিনি কতই না উচ্চ মর্যাদার নবী। তাঁর উচ্চ অবস্থান বা মোকামের সীমা কল্পনাও করা যায় না এবং তাঁর পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতার প্রভাব ও কার্যকারিতার সঠিক অনুমান করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আফসোস, তাঁর মর্যাদা যেভাবে সনাক্ত করা উচিত ছিল, সেভাবে সনাক্ত করা হয় নি। সেই 'তওহীদ' (আল্লাহ্‌র একত্ব) যা দুনিয়া থেকে গুম হয়ে গিয়েছিল, তিনিই একমাত্র বীরপুরুষ, তা দুনিয়াতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে মানুষের প্রতি ভালবাসায় জীবন অতিবাহিত করেছেন। এজন্যই খোদা, যিনি তাঁর (সঃ) হৃদয়ের রহস্য জানতেন, তিনি তাঁকে সমস্ত নবী এবং সমস্ত প্রথম ও শেষের ব্যক্তিগণের অর্থাৎ আওওয়ালীন ও আখেরীনদের উপর উন্নীত করেছেন। এবং তাঁর কাঙ্ক্ষিত সকল প্রত্যাশাই তাঁর জীবনে পূর্ণ করে দিয়েছেন। তিনি প্রত্যেক কৃপা ও কল্যাণের ঝরণার উৎস। যে ব্যক্তি তাঁর কৃপা ও কল্যাণ বা ফয়েযসমূহ স্বীকার না করেই কোনও প্রকারে কোনও শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করে সে মানুষ নয়, সে শয়তানের বংশধর। কেননা, প্রতিটি শ্রেষ্ঠত্বে চাবিকাঠি তাঁকেই দেয়া হয়েছে। এবং প্রত্যেক মা'রেফতের (জ্ঞান ও প্রজ্ঞার) ট্রেজারী তাঁকেই দান করা হয়েছে। যে তাঁর মাধমে না পায়, সে চির বঞ্চিত। আমি কী বস্তু, আমার আছেই বা কি! আমি নেয়ামত বা উত্তম পুরস্কারের অস্বীকারকারী হব যদি না আমি একথা স্বীকার করি যে, প্রকৃত তওহীদ আমি ঐ নবীর মাধ্যমেই লাভ করেছি। যিন্দা খোদার পরিচয় পেয়েছি ঐ কামেল ও পূর্ণ নবীর মাধ্যমেই, তাঁরই আলোকের মধ্য দিয়ে। খোদার সাথে কথা বলার এবং সম্বোধিত হওয়ার, যার মাধমে আমরা খোদার চেহারা দেখে থাকি তার সৌভাগ্য লাভ করেছি ঐ মহান নবীরই মাধ্যমে। ঐ হেদায়াতের সূর্যের রশ্মিমালা আমার উপরে প্রখর রৌদ্রের ন্যায় পতিত হয় এবং তার মধ্যে আমি যতক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে পারি, ততক্ষণ আমি আলোকিত হতে থাকি" (হকীকাতুল ওহী) - পৃঃ ১১৫,১১৬)।

"এখন আসমানের নীচে মাত্র একজনই নবী আছেন, এবং মাত্র একটিই কিতাব আছে অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লাম যিনি সকল নবীগণের চাইতে উন্নত এবং উত্তম এবং সকল রসূলে চাইতে শ্রেষ্ঠতর ও পূর্ণতর এবং যিনি মানবগণের মোহর, নবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, যাঁর আনুগত্য করলে খোদাতাআলাকে পাওয়া যায় এবং অন্ধকারের সব আবরণ খসে পড়ে এবং এই জগতেই প্রকৃত পরিত্রাণ বা নাজাতের চিহ্ন ও প্রভাব প্রকাশিত হয়। এবং কুরআন শরীফ যার মধ্যে প্রকৃত ও পূর্ণ হেদায়াত নিহিত রয়েছে, তার মাধ্যমে হাক্কানী ইল্‌ম ও মা'রেফত বা প্রকৃতজ্ঞান এবং খোদার উপলব্ধি, প্রজ্ঞা ও পরিচয় লাভ করা যায়, এবং হৃদয় মানবীয় দুর্বলতাসমূহ থেকে মুক্ত হয়, এবং মানুষ অজ্ঞতা, অলসতা ও সন্দেহ-সংশয়ের আবরণ থেকে বেরিয়ে এসে পরিত্রাণ পেয়ে যায় এবং হাক্কুল ইয়াকীন বা সত্য ও দৃঢ় বিশ্বাসের স্তরে বা মকামে পৌঁছে যায়" - (বারাহীনে আহ্‌মদীয়া, পৃঃ ৫৩৫, পাদটীকা)।

"আমরা নিশ্চিতভাবেই জানি যে, খোদাতাআলার সবচাইতে বড় নবী এবং সবচাইতে অধিক ভালবাসার পাত্র হচ্ছেন জনাবে মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম। কেননা, অন্যান্য নবীগণের উম্মতেরা সবাই অন্ধকারে পড়ে আছে এবং তাদের কাছে বাকি আছে শুধু অতীতের কেচ্ছা-কাহিনী। কিন্তু এই উম্মত হামেশাই খোদাতাআলার কাছ থেকে তাজা-তাজা নিদর্শন পেয়ে থাকে। এ কারণেই এই উম্মতের মধ্যে এমন বহু সংখ্যক আ'রেফ ব্যক্তি পাওয়া যায়, যাঁরা খোদাতাআলার প্রতি এরূপ উঁচু স্তরের দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন যে, তাঁরা যেন খোদাকে দেখতে পান। কিন্তু খোদাতাআলা সম্পর্কে এরূপ দৃঢ়-বিশ্বাস অন্য আর কোনও জাতির ভাগ্যে জুটে ওঠে না। অতএব, আমাদের আত্মা থেকে এই সাক্ষ্য উত্থিত হয় যে, সত্য এবং সঠিক ধর্ম একমাত্র ইসলাম।

.....

আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর মু'জেযা বা অলৌকিক নিদর্শনসমূহ কোন কেচ্ছাকাহিনীর কথা নয়, বরং আমরাও নিজেরা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করে, অনুবর্তিতা করে, অনুরূপ নিদর্শন লাভ করে থাকি। সুতরাং এভাবেই আমরা পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের কল্যাণে হক্কুল ইয়াকীন বা দৃঢ়-বিশ্বাসের স্তরে পর্যন্ত পৌঁছে যাই। কত না উন্নত সেই পূর্ণ পারফেক্ট, সেই পবিত্র নবী (সঃ)-এর মর্যাদা ও মহিমা যাঁর নবুওয়ত হামেশাই সত্যান্বেষীর কাছে তাজা নিদর্শন প্রদর্শন করে থাকে। এবং আমরা অনবরত নিদর্শন দেখার কল্যাণে এমন এক উচ্চ স্তরে পৌঁছে যাই যে, সেখান থেকে আমরা যেন স্বচক্ষে খোদাতাআলাকে দেখতে পাই। অতএব, ধর্ম উহাকেই বলা যায়, এবং সত্য নবী তিনিই হতে পারেন, যাঁর সত্যতার ভরা বসন্ত সর্বদা দৃষ্টি পথে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কেবল কেচ্ছা-কাহিনী যার মধ্যে হাজার রকমের কমবেশী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তার উপরে নির্ভর করাটা কোন জ্ঞানী মানুষের কাজ নয়। পৃথিবীতে শত শত লোককে খোদা বানানো হয়েছে, এবং শত শত পুরান কাহিনীর ভিত্তিতে তাদের মানাও হচ্ছে। কিন্তু আসল কথা তো এটাই যে, সত্য কারামত (অলৌকিক কার্য) কেবল তিনিই দেখাতে পারেন যাঁর কারামতের সাগর কখনই শুকিয়ে যায় না। এবং সেই ব্যক্তি হচ্ছেন আমাদের নেতা ও প্রভু নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম। খোদাতাআলা প্রত্যেক যুগে সেই কামেলও পবিত্র-পুরুষের নিদর্শন দেখাবার জন্য কোন না কোন ব্যক্তিকে পাঠিয়েছেন। এবং এ যুগে মসীহ্ মাওউদ নাম দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন। দেখো! আসমান থেকে নিদর্শন প্রকাশিত হয়ে চলেছে, এবং থেকে থেকেই বিভিন্ন প্রকারের অসামান্য ঘটনাবলী সংঘটিত হয়ে চলেছে। এবং প্রত্যেক সত্যান্বেষী ব্যক্তি আমার কাছে থেকে নিদর্শনাবলী দেখতে পারে, তা সেই ব্যক্তি খৃষ্টান, ইহুদী, আর আর্যই হোক না কেন। এবং এ সমস্ত কল্যাণ হচ্ছে আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের।"

"মুহাম্মদ (সঃ) উভয় জগতের ইমাম ও প্রদীপ, মুহাম্মদ (সঃ) আকাশ ও পৃথিবী আলোকিতকারী। আমি খোদাতাআলার ভয়ে তাঁকে খোদা তো বলতে পারি না, কিন্তু খোদার কসম, তাঁর সত্তা মর্তবাসীর জন্য খোদা-দর্শনের দর্পণ।"

(কেতাবুল বারিয়াহ্, পৃঃ ১৫৫-১৫৭, পাদটীকা)।

*(অবশিষ্টাংশ ২১-এর পাতায় দ্রষ্টব্য)*

# আল্লাহ্‌তাআলার দ্বিতীয় প্রধান সিফাত 'রহীম' গুণের বিস্তারিত বর্ণনা

[সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ২০ এপ্রিল, ২০০১ইং তারিখ, মসজিদে ফযল, লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্‌হুদ তাআওউয ও সূরা ফাতিহার পর হুযূর সূরাতু বনী ইসরাঈলের ১১১ আয়াত পাঠ করে খুতবা দেন।

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ؕ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ﴿۱۱۱﴾

অনুবাদ ঃ তুমি বলো, 'তোমরা আল্লাহ্‌ বলে ডাক বা রহমান বলে ডাক, যে কোন নামে তোমরা (তাঁকে) ডাকতে পার। কারণ সকল সুন্দরতম নাম তাঁরই। আর তুমি তোমার নামায উচ্চস্বরে পড়বে না ও উহা ক্ষীণ স্বরেও পড়বে না, বরং এ দুয়ের মাঝ পথ অবলম্বন করবে'।

আল্লাহ্‌তাআলার পবিত্র গুণাবলীর যে বর্ণনা আরম্ভ করেছি, সে তো এক কুলকিনারাবিহীন সমুদ্র। যদি আমার বাকী সারাটা জীবনও এ বিষয়ে বর্ণনা করি তবুও শেষ হবে না। যাই হোক, যতদূর সম্ভব বর্ণনা করার চেষ্টা করছি। প্রস্তুতি নিতে গিয়ে দেখি নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়ে চলেছে। প্রথমে ভাবলাম, কুরআন করীমে যে সমস্ত আয়াতে যেভাবে আল্লাহ্‌তাআলার সিফতসমূহের উল্লেখ হয়েছে সেগুলো বর্ণনা করব। তারপর দেখলাম, এভাবে যদি প্রথমে 'রহমান' সিফতের বর্ণনা করতে চেষ্টা করি তবে কেবল এই এক সিফতের বর্ণনায় বহুদিন লেগে যাবে। অনুরূপভাবে যদি 'রব্বুল আলামীন'- এর বর্ণনা জারী রাখতাম তবে তা-ও কতদিনে শেষ হ'ত বলতে পারি না।

তারপর 'রহীম' সিফতের বর্ণনার জন্য কেবল সূরা বাকারায় বর্ণিত আয়াতসমূহ যার মধ্যে সিফত 'রহীম'-এর গভীর সম্পর্ক রয়েছে, বের করে দেখলাম যে, এটাও একদিনে শেষ করা যাবে না। তাই আপাততঃ কুরআন শরীফের যে সমস্ত আয়াতে 'রহীম' সিফতের উল্লেখ রয়েছে- সে সমস্ত আয়াতের আলোকে 'রহীম' সিফতের ব্যাখ্যা বর্ণনা করতে চেষ্টা করছি।

প্রথমে আঁ হযরত (সঃ)-এর পবিত্র হাদীস থেকে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করছি।

হযরত জাবের (রাঃ) বর্ননা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, তিনটি বিষয় যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্‌তাআলা তাকে নিজ হেফাযত ও রহমতের মধ্যে রাখবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। প্রথম কথা এই যে, সে দুর্বলদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে, দ্বিতীয়তঃ পিতামাতাকে খুব ভালবাসে, তৃতীয়তঃ সে চাকর ও সেবকদের সাথে ভাল ব্যবহার করে। প্রথম দু'টি বিষয় তো সিফত রহমানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তৃতীয় বিষয় চাকর ও সেবকদের সাথে ভাল ব্যবহার এটা সিফত 'রহীম'-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। যারা আপনারা সেবায় নিয়োজিত বা চাকরি করে আপনি মালিক তাদের সাথে আপনার সদ্ব্যবহার 'রহীম' এর সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়। কারণ খেদমত নিয়ে সেই খেদমতের বদলে যা প্রদান করেন তা 'রহীম'-এর আওতাভুক্ত বিষয়।

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন ঃ

'মজুরকে তার ঘাম শুকোবার পূর্বেই মজুরী প্রদান কর।'

এটি একটি বড়ই হিকমতপূর্ণ কথা এবং 'রহীম' এর বিষয় যে, মজুরকে তার ঘাম শুকোবার পূর্বেই মজুরী দিয়ে দাও। এটি একটি প্রবচন যে, ঘাম শুকোবার পূর্বেই মজুরী প্রদান কর। অর্থ এই যে, কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে [নির্ধারিত সময়ের মধ্যে] মজুরী প্রদান কর।

হযরত মা'রুফ বিন ফুয়াদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি হযরত আবূ যর (রাঃ)-কে খুব সুন্দর পোশাক পরিহিত দেখলাম, আর তাঁর সাথে তাঁর কৃতদাসকেও দেখলাম ঠিক অনুরূপ কাপড় পরে আছে। আমি এ বিষয়ে হযরত আবূ যরকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আঁ হযরত (সঃ)-এর যুগে আমি একবার এক ব্যক্তিতে ভালমন্দ বলেছিলাম, এবং..... আঁ হযরত (সঃ) যখন জানতে পারলেন, হুযূর বললেন, 'তোমার মধ্যে এখনও বর্বরতার শিরা বাকী রয়ে গেছে। এসব কৃতদাসরাও তোমাদের ভাই যারা তোমাদের সেবা করে। আল্লাহ্‌ এদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। যাদের অধীনে এমন চাকর এবং সেবকরা রয়েছে সেই মনিবের উচিত তার চাকরকে অনুরূপ খাবার খেতে দেয় যা সে নিজে খায়, চাকরকে অনুরূপ কাপড় পরতে দেয় যেমন সে নিজে পরে। তোমরা দাসদের নিকট থেকে তাদের সাধ্যের বা ক্ষমতার অতিরিক্ত কাজ নেবে না। যদি কখনও তাদের কঠিন কাজ করতে বল তবে তাদের সাথে ঐ কঠিন কাজে নিজেও সাহায্য কর।"

আঁ হযরত (সঃ) যেসব নসিহত করতেন, তিনি নিজে প্রথমে তার উপর আমল করতেন। সমস্ত কঠিন সময়ে যখন সাহাবায়ে কেরাম কোন কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন, আঁ হযরত (সঃ) তাদের চেয়ে শক্ত কাজ নিজে করেছেন। তাছাড়া ঘর-সংসারের কাজেও হুযূর আকরম (সঃ) নিজ গৃহের মহিলাদের কাজে সাহায্য করতেন। আঁ হযরত (সঃ) যেসব নসিহত করতেন নিজে তার উপর প্রথমে আমল করতেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীস মুসলিম কিতাবুল ফাযায়েলে উল্লেখ হয়েছে। আঁ হযরত (সঃ) সকল মানুষের মধ্যে সবচে' উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। একবার হুযূর (সঃ) আমাকে কোন কাজের জন্য বললেন, আমি বললাম, আমি যাব না। কিন্তু আমার অন্তরে নিয়্যত ছিল যে, আমি অবশ্যই যাব। কারণ এটি তাঁর (সঃ) আদেশ।'

আঁ হযরত (সাঃ) নিজ খাদেমদের সাথে এত সহজ সরল সম্পর্ক রাখতেন যে, তারা সবরকম কথাবার্তা নির্ভয়ে বলতেন। সর্বদা সন্ত্রস্ত, ভীত, সংযত থাকতে হ'ত না। এখানে দেখুন,

হযরত আনাস (রাঃ) মুখে বললেন, 'আমি যাব না'। কিন্তু ভেতরে ভেতরে নিশ্চিত যে, অবশ্যই যাবেন। এখানে একটি সূক্ষ্ম বিষয় নিহিত আছে, এই যে, হুযূর (সঃ)-এর সাথে সর্বদা বড় আন্তরিকতা ও আদব রক্ষা করে তারা কথা বলতেন, বাহ্যতঃ না বললেও 'আদব' সম্মানকে বর্জন করা হয় নি। তারপর হযরত আনাস বলেছেন, আমি হুযূর (সঃ)-এর নির্দেশমত কাজের জন্য রওয়ানা হয়ে গেলাম। কিন্তু বাজারে একস্থানে ছেলে পুলেরা জমা ছিল, আমি তাদের

নিকট দাঁড়িয়ে গেলাম। আঁ হযরত (সঃ) পেছন থেকে এসে আমার ঘাড়ে ধরলেন, আমি যখন পেছন ফিরলাম, দেখি হুযূর হাস্‌ছেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে উনাইস! [আনাসকে (রাঃ) আদর করে অনেক সময় 'উনাইস' বলতেন] তুমি কি আমার কাজে গিয়েছিলে? আমি বললাম, হুযূর আমি এখনই যাচ্ছি।' হযরত আনাস (রাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র কসম! আমি প্রায় ৯ বছর হুযূর (সঃ)-এর খেদমত করেছি। জীবনে একটি বারও হুযূর (সঃ) আমাকে বলেন নি, 'তুমি একাজ কেন করেছ? বা 'একাজ কেন করনি?' (অর্থাৎ বকাবকি করেন নি।) [হযরত আনাস (রাঃ) যখন হুযূর (সঃ)-এর খেদমত শুরু করেছিলেন তখন ছোট বালক ছিলেন] হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, (মুসলিম কিতাবুল বির্‌র ওয়াস্‌ সিলাহ্‌) উম্মে সুলায়েম (রাঃ)-এর নিকট একটি এতীম বালিকা থাকতো। একবার আঁ হযরত (সঃ) ঐ বালিকাকে দেখে স্নেহভরে বললেন, 'তুমি এতবড় হয়ে গেছ? তোমার বয়স যেন আর বৃদ্ধি না হয়।'

এ বাক্য তো যিনি বলেছেন তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী অর্থ হবে। কেউ তো এমন কথা মন্দ অর্থেও বলতে পারে। এখানে হুযূর (সঃ) স্নেহ ও মমতার সাথে বলেছেন। আগামীতে যেন শীঘ্র বড় না হও। ঐ ঘটনার পরে ঐ বালিকা কাঁদতে কাঁদতে উম্মে সুলায়েমের (রাঃ) নিকট গেল।

হযরত উম্মে সুলায়েম বললেন ' মা, তুমি কাঁদছ কেন?' বালিকা বলল, হুযূর (সঃ) আমাকে এভাবে বদ্‌দোয়া দিয়েছেন। এখন তো আমি আর বাঁচব না। হযরত উম্মে সুলায়েম (রাঃ) তাড়াতাড়ি আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে হাযির হলেন। হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার! উম্মে সুলায়েম বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি কি আমার ঐ মেয়েটিকে বদদোয়া দিয়েছেন? হুযূর (সাঃ) বললেন, কি করে সম্ভব যে, আমি বদদোয়া দিব? উম্মে সুলায়েম বললেন, আপনি তো বলেছেন, তোমার বয়স যেন বৃদ্ধি না হয়। হুযূর (সঃ) হেসে ফেললেন, বললেন, আমি তো ঐ বালিকার সাথে এমনি স্নেহ করে আদর করে মজা করে বলেছি। তুমি কি জান না আমার প্রভু আল্লাহ্‌র নিকট আমি শর্ত করে রেখেছি যে, আমি একজন মানুষ, আমি খুশী, রাগান্বিত হই, হাসি-ঠাট্টা করি যেমন অন্যেরাও করে। হে আল্লাহ্‌! আমি যদি রাগ করেও কাউকে কিছু বলে দিই তবু হে আল্লাহ্‌ তুমি আমার শক্ত কথা বা বদদোয়াকে তার জন্য পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা ও তোমার নৈকট্যের কারণ বানিয়ে দিও যেন রোজ কেয়ামতে সে তোমার নৈকট্য লাভ করে।

এখানে দেখুন আঁ হযরত (সঃ)-এর কত সতর্কতা ছিল। তিনি খুবই ভাল করে কথা বলতেন। তিনি একথা বলেন নি যে, আল্লাহ্‌র সাথে শর্ত করা আছে যে, আমি বদদোয়া করলেও বদদোয়া হবে না। অনেক শত্রুর বিরুদ্ধে হুযূর (সঃ)-এর বদদোয়া হুবহু কবুল হয়েছে। বরং হুযূর (সঃ) বলেছেন, আমি যদি বদদোয়া দেই আর সে যদি বদদোয়ার পাত্র না হয় তবে হে আল্লাহ্‌! তুমি সেটা দোয়া হিসেবেই নিও। এখানে ঘটনা এই যে, ঐ বালিকাতো সম্পূর্ণ নির্দোষ। আমি যদি ভুল করে বদদোয়া দিতাম তবুও তা দোয়ার আকারেই প্রযোজ্য হোত।

হযরত সাহল বিন হানযালা রেওয়ায়াত করেছেন (তিরমিযী)। হযরত হানযালা বলেছেন, আঁ হযরত একবার পথ চলতে চলতে একটি উট দেখলেন যার পেট কোমরের সাথে লেগে আছে। এমন দেখে আঁ হযরত (সঃ) বললেন, তোমরা তোমাদের নির্বাক প্রাণীদের বিষয়ে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করবে। তোমরা এসব গৃহপালিত পশুগুলোকে যানবাহন হিসেবে ব্যবহার কর যখন এরা স্বাস্থ্যবান থাকে। এদের দিয়ে কাজ করাও যখন এরা সুস্থ সবল থাকে।"

এখানে 'রহীমিয়ত'-কে কাজে লাগাতে হবে। অর্থাৎ তাদের প্রতি দয়ালু হতে হবে। এসব গৃহপালিত পশুরা তোমাদের জন্য কষ্ট করে, তোমাদের কাজ করে দেয়। তারা বলতে পারে না। অতএব, তোমরা তাদের প্রয়োজনমত খাবার ইত্যাদি দিবে। সুতরাং সকল গৃহ পালিত পশু, গরু, মহিষ-সবার এমনই করা উচিত। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের পাঞ্জাবে অনেক সময়ে পশুকে এমন কাজে লাগানো হয় যে বেশী বোঝা চাপানো হয়, মার-পিট করা হয়। বিশ্রী গালিগালাজও করা হয়। ঐসব গালি তো পশুদের উপর পড়ে না বরং যে গালি দেয় তার উপরেই পড়ে।

সুতরাং এসব পশুদের সাথেও খুব দয়া প্রদর্শন করা উচিত। এটা রহীমিয়তের দাবী। আপনারা এদের জন্য রহীম হোন, আল্লাহ্‌ আপনাদের জন্য রহীম হবেন।

হুযূর (সঃ) বুঝাবার জন্য বলেছেন যে, উটের স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখো। নতুবা যখন উটের মাংস খাবে তখন ভাল অংশ পাবে না। তোমরা এসব পশুর প্রতি সদয় দৃষ্টি রাখ যার সুফল তোমরাই ভোগ করবে।

হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন জাফর (রাঃ) বলেছেন, (তিরমিযী কিতাবুল জিহাদ)। "একদিন হযরত রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) আমাকে তাঁর উটের পিঠে তাঁর পেছনে বসিয়ে নিলেন। তারপর হুযূর (সঃ) এমন একটি কথা বললেন, যা আমি কাউকে বলব না।"

আঁ হযরত (সঃ) অনেক সময়ে কাউকে কানে কানে বলে দিতেন, 'তুমি বেহেশ্‌তে যাবে।' এ ধরনের কথা কখনও কেউ প্রকাশ করতে চান না। আমার ধারণা যে, আঁ হযরত (সঃ) আব্দুল্লাহ্‌ বিন জাফরকে (রাঃ) এমন কথাই সম্ভবতঃ বলেছিলেন। অর্থ এই যে, হুযূর (সঃ) তাকে খুব ভালবাসেন।

একবার রসূল (সঃ) আনসারীদের একটি বাগানে প্রবেশ করলেন।

সেখানে একটি উট আঁ হযরত (সঃ)-কে দেখতেই গড়গড় করতে আরম্ভ করল। মনে হোল তার চোখেও পানি এসে গেছে। আঁ হযরত (সঃ) ঐ উটের কাছে গেলেন, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। এতে উটটি চুপ করে গেল। হুযূর (সঃ) ঐ উটের মালিককে ডাকলেন। মালিক এসে হাজির হলে হুযূর (সঃ) তাকে বললেন, 'আল্লাহ্‌ তোমাকে এ উটের মালিক বানিয়েছেন তুমি এর খোঁজ-খবর রাখ নি কেন? আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর না কেন? তোমার এ উট আমার কাছে অভিযোগ করেছে, তুমি একে খেতে দাও না কিন্তু বোঝা বহনের কাজে লাগাও।'

এখানে বুঝতে হবে, হুযূর (সঃ)-এর কাছে ঐ উট কীভাবে অভিযোগ করল? ঘটনা এই যে, হুযূর (সঃ) যে খুব বেশী দয়ালু ছিলেন তা পশুরাও বুঝতে পারত।

এ কথা ঠিক নয় যে, পশুরা কিছুই বুঝে না। যারা পশুকে মার ধর করে পশু তাদের দেখলেই ভয় পায়। আমাদের হাত থেকে তো অনেক সময় পশু খাবারও তুলে নিয়ে খায়। অতএব পশুকে মারধর করা উচিত নয়। ঐ উটটি হুযূর (সঃ)-কে দেখেই বুঝতে পেরেছিল যে, হুযূর (সঃ) বড়ই দয়ালু। তাই তো সে হুযূর (সঃ)-কে দেখেই গড়গড় করতে আরম্ভ করেছিল।

এবার হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) এর লেখা থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি পড়ে শোনাব। হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

"আল্লাহ্‌তাআলা মসীহে মাওউদকে 'ইসমে আহমদ' (আহমদ নাম সূরা সাফ্‌ফ ৬১ঃ৭)-এর বিকাশক বানিয়েছেন এবং রহীম ও জামাল নাম দিয়ে আবির্ভূত করেছেন। তাঁর মধ্যে দয়া ও কৃপার গুণকে লিখে দিয়েছেন। এভাবে তাঁকে উচ্চতর এবং সম্মানজনক চারিত্রিক গুণাবলী প্রদান করেছেন।"

হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) সিফতে রহীমিয়তের বিকাশস্থল ছিলেন। তিনি জামাতকে বলেছেন,'আমার মধ্যে তোমরা যে অসাধারণ দয়াশীলতা ও করুণার গুণ দেখছ এটা আল্লাহ্‌র

রহীম সিফতের বিকাশের কারণে। তিনি বলেছেন,

আমার তো অবস্থা এই যে, আমি যদি নামাযরত অবস্থায় থাকি, এমন সময় কারো বেদনাহত কান্নার শব্দ শুনি তো আমার মন অস্থির হয়ে যায়, মন চায় নামায ছেড়ে গিয়ে তার ব্যথা দূর করতে চেষ্টা করি এবং যতদূর সম্ভব তার নিকট সমবেদনা প্রকাশ করি।

কোন ভাইয়ের কষ্ট দেখেও তার নিকট সমবেদনা প্রকাশ না করা চারিত্রিক গুণ বর্হিভূত। যদি তার জন্য কিছুই করা সম্ভব না হয় তবে কম পক্ষে তার জন্য দোয়াতো করা উচিত। কেবল নিজেদের মধ্যেই নয় আমি চাই যে, তোমরা অমুসলিমদের সাথে হিন্দুদের সাথেও উচ্চতর চরিত্রের আচরণ কর। সবার কাছেই সমবেদনা প্রকাশ কর।"

আজ তো দুর্ভাগ্য এতটাই যে, মুসলমানদের প্রতি সমবেদনা প্রদর্শন করলেও তারা কঠোর ভাষায় এর প্রতিবাদ করে। তার তুলনায় হিন্দুদের সমাজে গিয়ে তাদের সেবা করা সহজ। কয়েকমাস পূর্বে গুজরাটে যে ভয়াবহ ভূমিকম্প এসেছিল সেখানে আমাদের স্বেচ্ছাসেবী টীম কাজ করেছে, এখনও করছে। এক স্থান থেকে খবর পেলাম যে, সেখানকার মুসলমানরা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। প্রশাসনের বড় বড় কর্মকর্তাদের গিয়ে বলেছে যে, তারা কঠোর ভাষায় এর জবাব দেবে কেন কাদিয়ানী টীম সেখানে তাদের সেবা-যত্ন করতে গেছে। যদি প্রশাসনের পক্ষ থেকে কাদিয়ানীদের নিষেধ না করা হয় তবে সেখানে হত্যাযজ্ঞ আরম্ভ হয়ে গেলে এর জন্য প্রশাসন দায়ী হবে। ফলে সেখানকার পুলিশের এস, পি, আমাদের আহমদী স্বেচ্ছাসেবী টীমকে অনুরোধ করেছেন যে, আপনারা কেন এদের সেবা দিতে চান যারা সেবা প্রত্যাখ্যান করে এবং কঠোর ভাষায় জবাব দিতে চায়। আপনারা হিন্দু এলাকায় কাজ করুন। অতএব হিন্দু এলাকায় আমাদের টীম অনেক কাজ করেছে। তারা সহযোগিতাও করেছে খুশীও হয়েছে। কিন্তু মুসলমানরা আমাদের রহীমিয়তের ব্যবহারকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এরা কীভাবে আল্লাহ্‌র রহীমিয়তকে লাভ করবে যারা সাহায্যকারীদের ওপরে জুলুম অত্যাচার করে? তারা তো রহীম আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) একটি বড় মজার ঘটনা লিখেছেন। "আমি একবার গ্রামের পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম । আমার সাথে আব্দুল করীম পাটওয়ারী সাহেবও ছিলেন। পাটওয়ারী আব্দুল করীম আগে আগে আর আমি পেছনে পেছনে হাঁটছিলাম। রাস্তায় এক ৭০/৭৫ বছর বয়সের বৃদ্ধার সাথে সাক্ষাৎ। বৃদ্ধা একখানা পত্র হাতে দাঁড়িয়ে কোন লেখা-পড়া জানা মানুষের অপেক্ষা করছিল। যখন আব্দুল করীম সাহেব ঐ বৃদ্ধার নিকটবর্তী হলেন, বৃদ্ধা তাকে ঐ পত্র পড়ে শোনাবার অনুরোধ জানাল। আব্দুল করীম সাহেব ঐ বৃদ্ধার পত্র পড়ে না দিয়ে তাকে সরে দাঁড়াতে বলে সামনে এগিয়ে গেলেন। আমার মনে আঘাত লাগল। যখন আমি সামনে গেলাম, বৃদ্ধা আমাকেও ঐ পত্র পড়ে দিতে বলল। আমি বড় উৎসাহের সাথে তার পত্র পড়ে সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলাম। পাটওয়ারী সাহেব পেছনে চেয়ে দেখেন যে, আমি ঐ বৃদ্ধার পত্র পড়ে পড়ে শোনাচ্ছি। ফলে তিনি লজ্জিত হলেন। আমাকে রেখে তিনি যেতেও পারলেন না আর পত্র পড়ে দিয়ে পুণ্যের ভাগীদারও হতে পারলেন না।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) মানুষের জন্য কতটা দরদ অনুভব করতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সিয়ালকোটী (রাঃ) -এর বর্ণনা পাঠ করলে। তবে সেখানে অবশ্য রহীমিয়তের তুলনায় রহমানিয়তের গুণ বেশী বিকাশিত হয়েছে। প্লেগের যুগে যখন হযরত (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হাজার হাজার লোক মারা যাচ্ছিল, মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হচ্ছিল। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) মানুষের মঙ্গলের জন্য প্লেগের আক্রমণে ধ্বংস হওয়া থেকে মানুষকে বাঁচাবার জন্য একদিকে বার বার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে, মানুষকে দিক-নির্দেশনা দিচ্ছিলেন, অপর দিকে রাত দিন আল্লাহ্‌র নিকট কেঁদে কেঁদে দোয়া করছিলেন, আল্লাহ্ তুমি এসব মানুষকে হেদায়াত দাও এবং বাঁচাও।"

একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ভ্রমণ শেষে বাড়ী ফিরলেন তখন কোন সাহায্যপ্রার্থী দূর থেকে সাহায্য চেয়ে আওয়াজ দিয়েছিল। হযরত (আঃ) সাহাবাদের কথা-বার্তার কারণে ভাল করে শুনতে পাবেন নি।

এখানে সাহায্যপ্রার্থীকে সাহায্য করা রহীমিয়তের বিষয়। অযাচিতন দান করার নাম রহমানিয়ত। অনেক বেশী দান করা রহমানিয়ত। কেউ যদি তোমার নিকট কিছু চায় তবে তার সাথে করুণা প্রদর্শন কর। গরীবদের সাথে দয়া প্রদর্শন করা রহীমিয়তের বিকাশ।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ঐ ফকীরের আওয়াজ শুনেছিলেন। কিন্তু সাহাবাদের কথা বার্তার কারণে স্মরণ রাখতে পারেন নি। হুযূর বাসায় প্রবেশ করার পর তাঁর স্মরণ হোল যে, ফকির আওয়াজ দিয়েছিল। তিনি পুনরায় বাইরে এসে জোরে জোরে সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন, ফকীর কোথায় গেল কেউ জানেন কি না। তারা বললেন, ফকীর তো তখনই চলে গেছে। হযরত (আঃ) ফেরত ভেতরে চলে গেলেন। কিন্তু তিনি কোন মতেই স্বস্তি পাচ্ছিলেন না, কারণ ফকীর খালি হাতে ফেরত চলে গেল এ তো ঠিক হোল না। আল্লাহ্‌র কি ইচ্ছা! কতক্ষণ পরে ফকীর আবার ফেরত এসে আওয়াজ দিল। হযরত সাহেব ফকীরের আওয়াজ শুনে খুব দ্রুত কিছু অর্থ হাতে নিয়ে বাইরে এলেন এবং ফকীরকে দিয়ে দিলেন। তারপর সাহাবাদের বললেন, ফকীর ফেরত যাওয়ার কারণে আমি খুব কষ্ট পাচ্ছিলাম। দোয়া করছিলাম, আল্লাহ্ তুমি এই ফকীরকে ফেরত নিয়ে আস।"

অপর এক স্থানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন,

"তৃতীয় প্রকারের কল্যাণ আছে যা বিশেষ ধরনের কল্যাণ। এখানে বিশেষ ধরনের কল্যাণ এবং সাধারণ প্রকারের কল্যাণের মধ্যে পার্থক্য আছে। সাধারণ প্রকার কল্যাণ প্রাপ্তির জন্য প্রাপকের পুণ্যবান হওয়া আবশ্যক নয়।"

যার প্রতি রহমানীয়তের করুণা বন্টন হয় তার জন্য পুণ্যবান হওয়া আবশ্যক নয় অথবা এমন নয় যে, তাকে রহমানিয়তের করুণা প্রাপ্তির যোগ্য হোতে হবে বা তাকে অন্ধকার থেকে প্রথমে বাইরে আসতে হবে। অথবা তাকে কোন প্রকার সাধনা করতে হবে। বরং প্রত্যেককে আল্লাহ্‌তাআলা তার প্রয়োজন মোতাবেক এই কল্যাণ প্রদান করেন। প্রাপকের প্রার্থনা বা চেষ্টা ছাড়াই তাকে তার প্রয়োজন মত দিয়ে দেন।

কিন্তু বিশেষ প্রকার কল্যাণ পেতে হলে বড় প্রচেষ্টা, বড় পরিশ্রম এবং আত্মার পবিত্রতার প্রয়োজন। অনেক বেশী দোয়া, আল্লাহ্‌র দরবারে অনেক বেশী কাকুতি-মিনতি করতে হয়। সকল প্রকার প্রচেষ্টা ও সাধনা করা, অবস্থা অনুযায়ী সাধনা করা শর্ত।

এখানে দেখুন, আপনারা যেসব দোয়া করেন এবং দোয়া কবুল হয় আর সে অনুসারে পেয়ে থাকেন। রহীমিয়তের জন্য অবশ্যই পরিশ্রমের শর্ত আছে। যেমন মজুর পরিশ্রম করে পারিশ্রমিক পায় তেমনই আপনারা যেমন পরিশ্রম করে আল্লাহ্‌র দরবারে কাঁদা-কাটি তার ফলে যা পান তাকে রহীমিয়ত বলা হয়।

হযরত (আঃ) বলেছেন, এ কল্যাণ সে পায় যে চেষ্টা করে, খুঁজে বেড়ায় এ কল্যাণ সে প্রাপ্ত হয় যেন এর জন্য পরিশ্রম করে, চেষ্টা করে। এমন কল্যাণ প্রকৃতির বিধান দ্বারাও প্রমাণিত। এটা তো বড়ই স্পষ্ট যে, আল্লাহ্‌র পথে যারা পরিশ্রম ও সাধনা করে এবং যারা কোন চেষ্টা করে না এরা

উভয়ে এক প্রকার হতে পারে না। নিঃসন্দেহে যারা পবিত্র আত্মা নিয়ে আল্লাহ্‌র পথে চেষ্টা করতে থাকেন এবং অশুভ পথ হতে বিরত থাকেন তারা এক বিশেষ রহমত লাভ করেন। এ কল্যাণ প্রদানের জন্য আল্লাহ্‌র নাম কুরআন শরীফে রহীম বলে উল্লেখ হয়েছে। আধ্যাত্মিক জগতের এ মর্যাদা সিফতে রহীমিয়তের মাধ্যমে বিশেষ শর্ত সাপেক্ষ হওয়ার কারণে সিফতে রহমানীয়তের পরে রাখা হয়েছে। কারণ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রথমে সিফতে রহমানীয়তের বিকাশ ঘটেছে। তারপর সিফতে রহীমিয়তের বিকাশ ঘটেছে। প্রকৃতিগতভাবে এই ধারাবাহিকতার কারণে সূরা ফাতিহার মধ্যে সিফতে রহীমকে সিফতে রহমানের পরে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, **"আর্ রাহমানির রহীম"**। অন্যান্য আয়াতেও সিফতে রহীমের বর্ণনা আছে। যেমন এক আয়াতে আছে, **"ওয়া কানা বিল মু'মিনীনা রহীমা"** অর্থ এবং তিনি মু'মিনদের প্রতি বড়ই কৃপালু" (আহযাব ঃ ৪৫)

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রহীমিয়তের কল্যাণকে মু'মিনদের জন্য নিদিষ্ট করা হয়েছে। এর থেকে কাফির বা বে-ঈমান অথবা সীমালঙ্ঘনকারীরা অংশ পায় না।

এখানে যে বিশেষত্ব বর্ণনা করা হয়েছে যে, কুরআনের শিক্ষা অনুসারে রহীম সিফতের বিকাশ মু'মিনদের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে। এ তত্ত্ব বিশেষ করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বর্ণনা করেছেন। যার ফলে আমরা বুঝতে পারছি যে, **বিল মু'মিনীনা রহীমা** কেন বলা হয়েছে। রহমানীয়তের সম্পর্ক সকল মানুষের সাথে। আল্লাহ্‌র রহমানীয়তের করুণা কাফির, মু'মিন, ভাল, মন্দ, শত্রু-মিত্র সকলের উপর বর্ষিত হচ্ছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বিশেষভাবে এ স্থান প্রাপ্ত হয়েছেন। নতুবা তিনি নিজে তো আপন-পর, হিন্দু-মুসলিম সবার প্রতি করুণা প্রদর্শন করতেন, সর্বসাধারণের প্রতি করুণা বা কৃপা সিফতে রহমানীয়তের অধীনে প্রকাশিত হোত। কিন্তু মু'মিনদের প্রতি করুণা বা কৃপা রহীমিয়তের কারণে করা হয়। মু'মিনরা তাঁর (আঃ) সাথে সকল প্রকার সহযোগিতা করতেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

"আল্লাহ্‌তাআলার রহীমিয়ত কেবল মু'মিনদের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত আছে। এর থেকে কাফির, বে-ঈমান অথবা সীমালঙ্ঘনকারীরা অংশ পায় না। দেখ, কত সুন্দর কথা যে, সিফতে রহীমিয়তকে আল্লাহ্ মু'মিনদের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। কিন্তু সিফতে রহমানীয়তকে কোথাও মু'মিনদের সাথে সম্পৃক্ত করেন নি। কুরআনে কোথাও রহমানীয়তকে মু'মিনদের সাথে নির্দিষ্ট করা হয় নি। বরং রহীমিয়তকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং রহমানীয়তকে সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। কোন কোন স্থলে আয়াতকে ঠিক ভাবে না বুঝলে অন্য রকম মনে হতে পারে। যেমন, তিনি অযাচিত অসীম দাতা যিনি কুরআন শিখিয়েছেন। তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তাকে স্পষ্ট কথা বলতে শিখিয়েছেন (সূরা রহমান ৫৫ঃ২)।

এখানে মনে হয় মু'মিনদের জন্য রহমানকে নির্ধারিত করা হয়েছে। কারণ কুরআন বা ওহী ইলহামের আলো প্রাপ্তি মূলতঃ আল্লাহ্‌র রহমান সিফতের ফলে ঘটে থাকে। অর্থাৎ আল্লাহ্ মু'মিনদের জন্যও অযাচিতভাবে কুরআন নাযেল করেছেন, না চাইতেই করেছেন, কোন অধিকারের ভিত্তি ছাড়াই অবতীর্ণ করেছেন। কিন্তু কোথাও **"কানা বিল মু'মিনীনা রহমানা"** মু'মিনদের জন্য রহমান' একথা বলা হয় নি। কিন্তু মু'মিনদের জন্য তিনি রহীম একথা বলেছেন, এবং 'রউফ' এরও উল্লেখ রয়েছে।

অন্যত্র বলা হয়েছে, **"ইন্না রহমাতাল্লাহি কারিবুম মিনাল মুহ্‌সিনীনা**, অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্‌র রহমত ন্যায়পরায়ণ মু'মিনদের অতি নিকটে (সূরা আরাফঃ৫৭)।

এখানে রহমত 'রহীমিয়ত' অর্থে বলা হয়েছে। হুযূর (আঃ) নিজেই অনুবাদ করেছেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র রহমত তাদের নিকটে যারা পুণ্যকর্ম করেন।" অপর একটি আয়াতে আছেঃ

"নিশ্চয় যারা ঈমান আনে, যারা আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করে ও জিহাদ করে, এরাই আল্লাহ্‌র কৃপার আশা রাখে; আর আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, বার বার কৃপাকারী"।

প্রকৃত হিজরত তো তাঁরাই করেছেন। নতুবা অন্য প্রকার হিজরত তো আরো অনেকেই করে। আল্লাহ্-ই ভাল জানেন যে, কারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই হিজরত করেছিলেন। আর কারা অন্য কোন পার্থিব উদ্দেশ্য নিয়ে হিজরত করেছিল। আমরা এ বিষয়ে কারো সম্পর্কে কিছু বলতে পারি না। আল্লাহ্‌ই প্রকৃত অর্থে সব কিছু জানেন। অন্তরের গোপন কথাও জানেন। অতএব, তিনি বলেছেন,

"যারা ঈমান এনেছিল এবং আল্লাহ্‌র খাতিরে নিজ দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। বিদেশে গিয়েও তারা সৎকর্ম করেছিলেন"।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

এরা আল্লাহ্‌র পথে নিজ নাফ্‌সের আকর্ষণ (মন্দের দিকে নাফসে আম্মারার আকর্ষণ) উপেক্ষা করে নিজেকে মন্দ কাজ থেকে দূরে রাখে; আল্লাহ্‌র পথে চেষ্টা করে; তারা রহীমিয়তের কল্যাণ লাভের আশাবাদী এবং আল্লাহ্ গফুরুর রহীম। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রহীমিয়তের কল্যাণ অবশ্যই তাদের সহযোগী হয়, যারা এর উপযুক্ত পাত্র। কেউ এমন নেই যে, এটি পাওয়ার চেষ্টা করেছে কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

"আমি সত্য সত্যই বলছি, মানুষের ঈমান কখনও পুর্ণতা লাভ করে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজের আরাম-আয়েশের উপরে নিজের ভাইয়ের আরামকে প্রাধান্য দেয়। আমার একভাই যদি আমার সামনে অসুস্থতা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও মাটিতে শোয় আর আমি সুস্থ সবল হয়েও চৌকি দখল করে রাখি যেন কোন ভাই এসে বসে না যায় তবে আমার অবস্থা দুঃখজনক।"

এখন তো সুস্থ সবলরাই তাড়াহুড়া করে। চৌকি বা ভাল জায়গা দখল করে নেয়। দুর্বলরা দাঁড়িয়েই থেকে যায়। এটা রহীমিয়তের বিপরীত। দুর্বলদের প্রতি দয়া করে না এবং শক্তিশালীদের ভয় করে। দুর্বলদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা রহীমিয়ত। যারা দুর্বলদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে, তাদের প্রতি আল্লাহ্ করুণা প্রদর্শন করবেন। হযরত (আঃ) বলছেন,

"আমি যদি নিজ ভাইয়ের প্রতি ভালবাসার কারণে আমার নিজের চৌকিটি ভাইকে না দেই তবে আমার এহেন অবস্থা দুঃখজনক।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নিজ জীবনে অনেক বারই এমন হয়েছে যে, নিজের চৌকির তো কথাই নেই, বিছানা, লেপ পর্যন্ত মেহমানদের দিয়ে দিয়েছেন। স্বয়ং বড় কোট পরে নিয়ে বসে বসে রাত কাটিয়ে দিয়েছেন। অথচ কঠিন শীতের রাত ছিল। সুতরাং আল্লাহ্‌র বান্দারা যারা কষ্ট স্বীকার করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এতদূর আসতেন তাদের জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এ ধরনের কষ্ট স্বীকার করতেন। আঁ হযরত (সঃ) যেমন নিজ সাহাবায়ে কেরামের জন্য খুব ভালবাসার অনুভূতি রাখতেন তেমন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নিজ সাহাবাদের জন্য নিজের সমস্ত আরামকে বিসর্জন দিতেন।

তারপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, "আমার ভাইয়ের যদি কোন কিছুর প্রয়োজন হয় আর আমি তার জন্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির চেষ্টা না করে আরামে শুয়ে থাকি তো আমার অবস্থা বড় দুঃখজনক।"

অন্যত্র হযরত (আঃ) বলেছেন,

দোয়া কেবল এক ফরয আদেশই নয়, আর না এমন ইবাদত যার ফলে কোন কল্যাণ প্রাপ্তি হয়।

ঐ সকল মানুষ যারা আল্লাহ্‌কে সঠিকভাবে চিনতে পারে নি যেভাবে চেনা উচিত, আর না তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করেছে, আর না তারা প্রকৃতির বিধানকে গভীরভাবে দেখেছে, তারা অমন মনে করে।

প্রকৃত সত্য এই যে, দোয়ার ফলে অবশ্যই এমন কল্যাণ প্রাপ্তি হয় যদ্বারা আমরা স্বস্তি লাভ করি। এরই নাম রহীমিয়তের কল্যাণ। যার মাধ্যমে মানুষ উন্নতি করতে থাকে। এরই মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্‌র বন্ধু হওয়ার মর্যাদা লাভ করে। আর আল্লাহ্‌র উপর এমন নিশ্চিত ঈমান ও দঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হয়। যেমন স্বচক্ষে দেখে নিয়েছে।

বিষয়টি রহীমিয়তের আওতাভুক্ত। আযানের পর যে দোয়া আমরা করি এবং কামনা করি যে, আঁ হযরত (সঃ) আমাদের জন্য শাফায়াতকারী হোন। এ সম্পর্কে জানতে হবে যে, যে কেউ পরিশ্রম হবে তার জন্য আঁ হযরত (সঃ) সুপারিশকারী হবেন। মৌলবীরা এ সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা সৃষ্টি করে মুসলমানদের জন্য ধ্বংসের উপায় উদ্ভাবন করেছে। তোমরা যা খুশী মন্দ কাজ করবে আঁ হযরত (সঃ) তাকে সুপারিশ করবেন। পাপ কর্ম যতই কর, তিনি সুপারিশ করতে পারেন যদি সুপারিশ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ইস্তিগফার করতে থাক, তওবা করতে থাক, বারবার পাপের ক্ষমা চাইতে থাক।

আঁ হযরত (সঃ) তাদের জন্য সুপারিশকারী হবেন যারা উপরোক্ত গুণাবলীর অধিকারী। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্‌তাআলা বারবার আমাকে ক্ষমা করেছেন।

এখানে গুণাহ্‌র অনুভূতি এজন্য যে, সকল মানুষ দ্বারা পাপকর্ম ঘটে যায়। হযরত (সঃ) নবী হওয়ার কারণে নিষ্পাপ ছিলেন তবুও তওবা করতেন- এদিক থেকে দেখলে তো আমাদের কতবার তওবা করা উচিত। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও হযরত (আঃ)-এর জীবনী পড়ে দেখুন তিনি কত বেশি বিনয় অবলম্বন করতেন। বারবার বলতেন, আমার দ্বারা পাপ হয়েছে এবং আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করছেন। অতএব, তওবা বারবার করবে যেন আল্লাহ্ বারবার তাদের প্রতি কৃপা করতে পারেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, "সুপারিশের বিষয়টিও সিফতে রহীমিয়তের অন্তর্ভুক্ত।"

দেখুন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় আমাদিগকে বুঝিয়েছেন। আপনারা হযরত (আঃ)-এর বইপত্র পড়েন নিশ্চয়ই, কিন্তু সাধারণতভাবে পড়ে গেলে গভীর দৃষ্টি দিয়ে অন্তর্নিহিত বিষয় বুঝাতে চেষ্টা না করলে বড় কিছু পাবেন না।

তারপর হযরত (আঃ) বলেছেন,

আল্লাহ্‌তাআলার রহীমিয়তের বিকাশ এভাবে হয়েছে যে, তিনি চেয়েছেন, ভাল মানুষ মন্দ মানুষের জন্য সুপারিশ করুক।'

দেখুন, একথা ভুল যে, মুসলমানরা নির্বিঘ্নে পাপাচারে লিপ্ত থাকবে আর আঁ হযরত (সঃ) সুপারিশ করবেন। প্রকৃত সত্য এই যে, তওবার শর্ত অবশ্যই আছে। বারবার তওবার শর্ত আছে। রহীমিয়ত বারবার তওবার ফলশ্রুতিতে বিকশিত বা উন্মুক্ত হয়। বারবার তওবা কর তো আল্লাহ্ বারবার কৃপা প্রদর্শন করবেন। যদি তওবা করতে শিথিলতা দেখাও তো পাপ তোমাকে ভেতরে ভেতরে খেয়ে ফেলবে, তুমি বুঝতেও পারবে না। তওবা থেকে গাফিলতি সত্ত্বেও আঁ হযরত (সঃ)-এর সুপারিশ পাওয়ার আশা করা বেয়াদবী হবে, তাঁর (সঃ) মহিমান্বিত হওয়ার স্বীকারোক্তি হবে না।

আঁ হযরত (সঃ)-এর একটি হাদীস পেশ করছি। হযরত আবূ মাসুদ (রাঃ) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের একজন বর্ণনা করেছেন, একবার আমি আমার কৃতদাসকে চাবুক মারছিলাম। হঠাৎ আঁ হযরত (সঃ)-এর আওয়াজ শুনতে পেলাম, "হে আবূ মাসুদ"! আঁ হযরতের (সঃ) কণ্ঠস্বরে বড় কঠোরতা ছিল। আমি তাড়াতাড়ি বুঝতে পারি নি যে, কার কণ্ঠস্বর। আঁ হযরত (সঃ) বললেন, "হে আবূ মাসুদ ! স্মরণ রাখ যে, আল্লাহ্‌তাআলা তোমার চেয়ে বেশী ক্ষমতাবান"। আমি অঙ্গীকার করলাম, আজকের পরে কখনও কৃতদাসকে মারব না। অন্য এক বর্ণনায় আছে, আবূ মাসুদ বললেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ্ আমি আল্লাহ্‌র খাতিরে এই দাসকে মুক্ত করে দিচ্ছি"। আঁ হযরত (সঃ) বললেন, "তুমি যদি এমন না করতে তবে আগুন অবশ্যই তোমাকে জ্বালিয়ে দিত।"

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, 'তোমাদের দাস, চাকর যখন তোমাদের নিকট খাবার নিয়ে আসে তখন তোমরা তাকে নিজের সাথে যদি খাওয়াতে না-ও পার তবু তোমাদের খাবারের থেকে ১/২ মুঠি খাবার তাদের খেতে দাও। কারণ সে তোমাদের জন্য খাবার প্রস্তুত করেছে।

অর্থাৎ যে বাবুর্চি খাবার পাক করে তাকে কমপক্ষে কিছু অংশ খেতে দিতে হয়। এটা আঁ হযরত (সঃ)-এর সুন্নত ছিল। একজন সাহাবী একবার তাঁর কৃতদাসকে জোরে চড় মেরেছিলেন। আঁ হযরত (সঃ) তাকে আদেশ দিলেন যে, তুমি তোমার কৃতদাসকে মুক্ত করে দাও (মুসলিম)।

হযরত ওসমান নিজ পিতার নিকট হতে বর্ণনা করেছেন (মুসলিম, কিতাবুল বির্‌র)। একবার হাস্‌সান বিন হাকীম বিন হেজাম কিছু মানুষের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, দেখলেন এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। হাস্‌সান বিন হাকিম বিন হেজাম জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার ? লোকেরা বলল যে, তাকে (জিজিয়া) কর প্রদান না করার কারণে আটক করে রাখা হয়েছে। একথা শুনে হাস্‌সান বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আঁ হযরত (সঃ)কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ ওসব লোকদের শাস্তি দিবেন যারা পৃথিবীতে মানুষকে শাস্তি দেয়।"

বিশেষ করে যারা অধীনস্থ দিনমজুর বা কোন কারণে কারোও অধীনস্থ হয়ে আছে, অনুরূপভাবে দেশের প্রজারা - এদের মঙ্গল যারা চায় না তারা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে শাস্তি আশাই করতে পারে।

জোহরী বলেছেন, আমাকে সাবেত বিন কায়েস বলেছেন (মুসনদ আহমদ)। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। আঁ হযরত (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, "বাতাস আল্লাহ্‌র রহমতের সাথে সম্পর্ক রাখে, কখনও বাতাস আল্লাহ্‌র রহমত আর কখনও বাতাস শাস্তি নিয়ে আসে। সুতরাং কখনও বাতাসকে গালি দিও না। বরং এর মধ্যে যে কল্যাণ নিহিত আছে আল্লাহ্‌র নিকট সেই মঙ্গল চাও এবং এর মধ্যে যে অমঙ্গল আছে আল্লাহ্‌র কাছে সেই অমঙ্গল থেকে রক্ষার জন্য সাহায্য চাও।"

কোন কোন সময় ঝড়-তুফানকে মানুষ গালি দেয় অথচ এসব প্রকৃতির বিধান। এসবকে গালি দেয়া আল্লাহ্‌কে গালি দেয়ার নামান্তর। এভাবে নিজের আযাবকে বৃদ্ধি করা ব্যতিরেকে কোন লাভ হবে না। এ সম্পর্কে আরেকটি হাদীস আছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন (মুসলিম)। আল্লাহর রসূল (সঃ) বলেছেন, যুগকে গালি দিবে না। কারণ আল্লাহ্ যুগকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তো যুগ। যুগকে গালি দিলে সে গালি আল্লাহ্‌কেই দেয়া হবে।

আঁ হযরত (সঃ) সকল প্রকার সতর্কতা আমাদিগকে শিখিয়েছেন। প্রত্যেক প্রকার ভয়-ভীতির কারণ আমাদিগকে জানিয়ে দিয়েছেন আর তিনি 'নাযির (সতর্ককারী)' হওয়ার পুরো দায়িত্ব পালন করেছেন। যদি ঠিক ঠিক সতর্কতা ও সাবধানতার সংকেত না দেয়া হোত তবে মানুষ বহু ধ্বংসের সম্মুখীন হোত।

আঁ হযরত (সঃ)-এর রহীমিয়তের চূড়ান্ত প্রকাশ দেখুন, বলেছেন, মোরগকে গালি দিও না কারণ সে নামাযের জন্য জাগিয়ে দেয়।

সকালে মানুষ মোরগের ডাক শুনে জেগে উঠে। সে তো ইচ্ছাকৃত এমন করে না, বরং

প্রকৃতিগতভাবে এর মধ্যে এ স্বভাব সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে। সে তো তোমাদের খেদমত করছে। অতএব, রহীমিয়ত এই যে, তোমরা তাকে গালি দিবে না বরং তার সাথে ভাল ব্যবহার কর।

হযরত আদী বিন হাতেম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন (তিরমিযী)। আমি আঁ হযরত (সঃ)-এর নিকট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের শিকার ধরন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। হুযূর (সঃ) বলেছেন, যদি প্রশিক্ষণ দেয়া কুকুরকে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে ছেড়ে দিয়ে থাক তবে ধরে রাখা শীকার খাও, যদি কুকুর ঐ শীকারকৃত প্রাণীর কিছু মাংস খেয়ে ফেলে থাকে তবে তোমরা তা খেও না। কারণ কুকুরের কামড়ে ঐ শিকার (প্রাণী) বিষাক্ত হয়ে যায়। যদি সে খেয়ে থাকে তবে তোমরা খাবে না, কারণ বুঝতে হবে যে, সে নিজের জন্য শিকার করেছে। যদি সে তোমার জন্য শিকার ধরত তবে সে নিজে খেত না বরং তোমার জন্য ধরেই রাখত। সাহাবী পুনরায় জিজ্ঞেস করেছেন, যদি আমাদের কুকুরের সাথে অন্য কুকুরও শিকার ধরতে শরীক হয়ে যায় তবে কী করণীয় হবে। হুযূর (সঃ) বললেন, 'জানা নেই কোন কুকুরের কামড়ে শিকার ধৃত হয়েছে অতএব এমন শিকারকৃত জন্তু খাবে না। তাক্‌ওয়াহ্‌ অবলম্বন কর। তোমাদের প্রশিক্ষণ দেয়া কুকুর যাকে আল্লাহ্‌র নাম করে ছাড়া হয় সে তো তোমাদের সেবায় নিয়জিত।'

হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বি ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, এক মহিলাকে তার বিড়ালের কারণে শাস্তি দেয়া হয়েছিল। সে বিড়ালকে বেঁধে রেখেছিল এবং ঐ অবস্থায় বিড়াল মরে গিয়েছিল। ফলে ঐ মহিলা দোযখে প্রেরিত হয়েছিল।

মহিলা বিড়ালকে বেঁধে রেখেছিল। নিজেও খাবার দেয় নি। তাকে ছেড়েও দেয় নি যে, সে নিজে খাবার খুঁজে খেত। এখানে সিফতে রহীমিয়তের সম্পর্ক অবশ্যই আছে। আল্লাহ্‌তাআলা পশুদেরকে মানুষের মুখাপেক্ষী করেন নি। তারা স্বাধীনভাবে বিচরণ করে নিজেদের প্রয়োজনীয় আহার সংগ্রহ করে নিতে পারে। মানুষ কুকুর বিড়ালকে খেতে দেয়। কিন্তু না দিলেও তারা সংগ্রহ করতে পারে। ঐ মহিলা বিড়ালকে বেঁধে রেখেছিল, ফলে বিড়াল নিজে খাবার সংগ্রহ করতে পারে নি। এবং এভাবে না খেয়ে মারা গেছে। অতএব এ মহিলা সম্পর্কে হুযূর (সঃ) বলেছেন, সে দোযখী।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন (বুখারী কিতাবুল হাজ্জ)। 'একবার হজ্জের সফরে দেখলেন, এক বৃদ্ধ তার দুই ছেলের কাঁধে ভর দিয়ে বড় কষ্টে নিজেকে টেনে-হেঁচড়ে সফর করে যাচ্ছে। হুযূর (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার? ওরা জানাল যে, বৃদ্ধ মানত করেছে যে, পায়ে হেঁটে হজ্জ করতে যাবে। হুযূর (সঃ) বললেন, আল্লাহ্‌র কাছে এভাবে মানুষের এত কষ্ট করার কোন প্রয়োজন নেই। অতএব তাদের বললেন, কোন যান-বাহনের উপরে চড়ে সফর কর।

এখানে রহীমিয়তের সম্পর্ক এই যে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একটি কাজ করা হচ্ছিল। কিন্তু নিজ বাহু বলে আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করা যায় না বরং আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টিই সৃষ্টি হয়। কারণ আল্লাহ্‌ মানুষের প্রতি বড়ই দয়ালু। তিনি মানুষকে কষ্ট দিতে চান না।

**লা ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফসান ইল্লা উস্‌য়াহা** (সূরা বাকারা ঃ ২৮৭) অর্থ ঃ "আল্লাহ্‌ কোন ব্যক্তির উপর তার সাধ্যের অধিক দায়িত্বভার চাপান না।"

আল্লাহ্‌ কাউকে তার সাধ্যাতীত কষ্ট দেন না। অতএব, তোমরাও তোমাদের সন্তানদের জন্য অতিরিক্ত কষ্টের কারণ হয়ো না। ঐ বৃদ্ধ নিজে কষ্ট পাচ্ছিল, সাথে ছেলেদেরকেও কষ্টের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। সুতরাং তার এমন কর্ম আল্লাহ্‌র রহীমিয়তের করুণা পাওয়ার যোগ্য ছিল না। বরং আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারত।

এখনও অনেক বেশী বর্ণনা বাকী রয়েছে গেছে। আমি চেষ্টা করব কুরআনের যে সমস্ত আয়াতে রহীমিয়তের উল্লেখ আছে সেগুলোকে সামনে রেখে বক্তব্য পেশ করব যে, আয়াতে বর্ণিত সিফতে রহীম কোন পরিবেশে কীভাবে ব্যবহার হয়েছে। কীভাবে সিফতের বিকাশ ঘটেছে।

অবশেষে আমি আপনাদের সামনে আমার ডাক বা আপনাদের চিঠিপত্র সম্পর্কে কিছু বলতে চাই।

আপনাদের যেসব চিঠিপত্র আমার কাছে আসে, এক সময় এসব চিঠিপত্র সারাংশ হয়ে আমার কাছে পৌছে। এখনও করাচী, রাবওয়াহ্‌ ইত্যাদি স্থান থেকে সারাংশ হয়েই আসছে। কিন্তু যেসব চিঠি সরাসরি আমার কাছে পাঠানো হয় সেগুলো আমি নিজেই পড়ি। এগুলোর সারাংশ করা হয় না। অতএব আপনারা যদি চান যে, আমি নিজে চিঠিগুলো পড়ি তবে সংক্ষেপে লিখবেন।

একবার একজন মহিলা ১৫/১৬ পৃষ্ঠার চিঠি লিখেছেন, শেষে লিখেছেন, আপনার সময় খুব মূল্যবান তাই সংক্ষিপ্ত করলাম।

অথচ জরুরী কথা তেমন কিছু ছিল না। নিজেদের পরিবারের ঘটনাবলী লিখেছেন। সুতরাং এত লম্বা চিঠি লিখবেন না। এমন না হয় যে, আবার পুনরায় সারাংশ করার ব্যবস্থা আরম্ভ করতে বাধ্য হই। আপনার যদি অনেক বেশী লিখতে ইচ্ছা করে তবে প্রথমে ৪০/৫০ পৃষ্ঠার একটি চিঠি লিখুন তারপর নিজেই সারাংশ করে আমাকে পাঠান। কেবল জরুরী কাজের কথা লিখুন।

এছাড়া শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর ঝগড়া, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া, ইত্যাদি লিখবেন না। কারণ আমি এমন ঝগড়া বিবাদের চিঠি পত্র নাযের ইসলাহ্‌ ও ইরশাদ অথবা নাযের উমুরে আমার দফতরে পাঠিয়ে দেই। কারণ এক তরফা একপক্ষের বিবরণ শুনে তো আমি মীমাংসা করতে পারি না। বাধ্য হয়ে জামাতী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পাঠাতে হয়। যাদের নিকট আমি এমন পত্র পাঠাই তারা বিচার-বিশ্লেষণ করে অনুসন্ধান করে আমাকে সংক্ষেপে রিপোর্ট করে থাকেন।

হ্যাঁ, কেবল দোয়ার জন্য আমাকে লিখবেন যে, অমুকের সাথে বিরোধ হয়েছে হুযূর দোয়া করেন। বিস্তারিত বিবরণ আপনার জামাতের নেযামের কাছে বলছেন, তথা ইসলাহ্‌ ও ইরশাদ বা উমুরে আমার নিকট বিস্তারিত লিখুন। তারা আমাকে জরুরী বিষয় অবগত করবেন।

ইদানিং আর একটি বিষয় আরম্ভ হয়েছে। কোন কোন সাহেব কম্পিউটারে পত্র লিখে সংরক্ষিত করে রাখেন। যেমন ইচ্ছা হয় ঐ একই পত্রের প্রিন্ট বের করে পাঠিয়ে দেন। এমন পত্রের কী অবস্থা হবে। সেখানে তো আত্মার বা হৃদয়ের ছোঁয়া লাগেই না। বেশী ভাল হয় নিজ হাতে লেখা চিঠি। কেবল আসল কথা, জরুরী কথা লিখুন। পত্রের আরম্ভেই জরুরী উদ্দেশ্য এবং আসল উদ্দেশ্যের কথা লিখুন : তারপর যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে যা জরুরী বিবরণ দেয়া দরকার তা লিখুন। পত্রের শেষে আসল কথা লিখবেন না। এতে আমার সুবিধা হবে।

কেউ কেউ পত্র লিখে ফটো কপি করে রেখে দেন। যখন মন চায় এক খানা ফটো কপি পোষ্ট করে দেন। প্রথম বার তারিখ লিখেন না। প্রতিবার পোষ্ট করার সময় ফটোকপির উপরে হাতে কলম দিয়ে তারিখ লিখেন। স্পষ্ট বুঝা যায় যে, পরে তাজা তারিখ লেখা হয়েছে।

**দোয়ার আবেদনের জন্য অন্তরের আবেগ ও অনুভূতি প্রয়োজন। যদি অন্তরের আবেগ আমার কাছে পৌছে যায় তবে তার জন্য দোয়া বের হয়ে আসে; তা সে চিঠি সপ্তাহ্‌ পরে বা মাস পরেই আমার কাছে আসুক। কিছু যায় আসে না। নতুবা আমি খুঁজতে থাকি কী চায় লেখক, কী উদ্দেশ্য তার। আগামীতে আপনারা পত্রের আরম্ভে আসল উদ্দেশ্য উল্লেখ করবেন।** এখানেই শেষ করছি।

অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, মুরব্বী সিলসিলাহ্‌

কবিতা

# না'তে রসূল (সঃ)

"বরতর গুমান ও ওহম ছে আহমদ কি শান হ্যায়
য়েছকা গোলাম দেখো মসীহুজ্জামান হ্যায়।"
*–এলহাম : হযরত মসীহ মাওউদ–(আঃ)*

মোহাম্মদ–যিন্দাবাদ
নূরে খোদা– যিন্দাবাদ
আহ্‌লুহু–যিন্দাবাদ–যিন্দাবাদ, যিন্দাবাদ

সাইয়্যেদুল মুরসালীন শাফিয়ে ইয়াওমে দ্দীন
খাতামুন্নাবিয়ীন লে -আউয়ালীন ও আখেরীন
সরওয়ারে কায়েনাত–যিন্দাবাদ, যিন্দাবাদ ॥

রাহাতে আশেক্বীন মাশুকে তাহেরীন
আনিসেল গারেবীন শামসিল আরেফীন
ফখ্‌রে মওজুদাত–যিন্দাবাদ, যিন্দাবাদ ॥

সিরাজুম মুনীরা উস্‌ওয়াতুল হাসানা
তোয়াহা, ইয়াসীন খুলুকিন আযীমিন
লিন্নাসে বাইয়্যেনাত–যিন্দাবাদ, যিন্দাবাদ ॥

সিরাতে মুস্তাকীম নাজাতে মুযনাবীন
রহ্‌বারে মুত্তাকীন রহমতে আলামীন
লিন্নাসে ফযিলত–যিন্দাবাদ, যিন্দাবাদ ॥

মুজাক্কিয়ে ইনসান খুলুকুহু কুরআন
আয়াতে রহমান আল্লামাহু বায়য়ান
সাহেবে শাফায়াত–যিন্দাবাদ, যিন্দাবাদ ॥

রসূলান শাহেদা কুল্‌-মুলুকে হুম্মেদা
মুজতবা ও মুকতাদা সল্লে 'আলা মোস্তাফা
লিন্নাসে আল্লাদাদ–যিন্দাবাদ, যিন্দাবাদ ॥

কামাল শারাফাত হুস্‌ন ও এহ্‌সানাত
খত্‌মে রেসালত জালাল ও জামালাত
খতমে ইনসানিয়াত–যিন্দাবাদ, যিন্দাবাদ ॥

ওয়ানশাক্কা কামারুন বাশীর ও নাযীরুন
শাহেদুন, গালেবুন আহমাদ ও মাহ্‌মুদুন
সাহেবে দারাযাত–যিন্দাবাদ, যিন্দাবাদ ॥

রাহ্‌বারে সালেকীন সরওয়ারে সালেহীন
শাহেদীন–সিদ্দীকিন ইমামুন নাবীয়্যিন
মোহরে এনআমাত–যিন্দাবাদ, যিন্দাবাদ ॥

কাবাকাওসায়ন ইলাল্লাহে মুতমাঈন
সাহেবে তাদাল্লা মাকামাম্মাহ্‌মুদা
কাওসারে কামালাত–যিন্দাবাদ যিন্দাবাদ ॥

সল্লাল্লাহু আলায়কা আলে ও আহলেকা
ও আলা আসহাবেকা ওয়া আলা মসীহিকা
কাওসারে বারাকাত–যিন্দাবাদ, যিন্দাবাদ ॥

ফিল উম্মিইনা মিনহুম ও'খারিনা মিনহুম
ইত্তাবেয়ূনি য়ুহ্‌বেবকুম লা-তাসরিবা আলায়কুম
মোকামে ইতায়াত–যিন্দাবাদ, যিন্দাবাদ ॥

সলাতি, নুসুকি মাহ্‌ইয়ায়া মামাতি
লিল্লাহে রব্বি.... মালেকী মাবূদী
কামালে উবূদিয়্যত–যিন্দাবাদ, যিন্দাবাদ ॥

বাখেউন নাফসাকা মাওয়াদ্দা'কা রব্বুকা
রাফানা লাকা যিকরাকা রামাল্লাহ্‌ ইয রামায়তা
আয়নায়ে উলুহিয়্যত–যিন্দাবাদ, যিন্দাবাদ ॥

মিনাল্লাহে সুল্লেমা ফী-সিদরাতেল মুন্তাহা
ইলায়কুম জামিয়া ইউহা ইলায়য়া
ফায়েকে বাশারিয়্যত–যিন্দাবাদ, যিন্দাবাদ ॥

সাইয়্যিদনা মোহাম্মদ শাফীয়ীনা মোহাম্মদ
মাওলানা মোহাম্মদ মাহ্‌বুবুনা মোহাম্মদ
আল্লাহ্‌-নোমা মোহাম্মদ–যিন্দাবাদ, যিন্দাবাদ ॥

রব্বুন, কারীমুন হাক্কুন, আহাদুন
কাইয়্যুম ও হাঈয়্যুন রউফুন ও রহীমুন
মাযহারে উলুহিয়্যত–যিন্দাবাদ, যিন্দাবাদ ॥

"ফামা আযামা শানো কামালেহি
আল্লাহুম্মা সল্লে আলায়হে ওয়া আলেহি।"
*–হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)*

– অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান

# সদৃশ-বিধান চিকিৎসা

-হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)

### ঔষধ নম্বর-১৭
### এনথ্রাসিনাম
ANTHRACINUM

অসুস্থ ভেড়ার Spleen-(প্লীহা)-এর পচনগ্রস্থ অংশ থেকে এই **এনথ্রাসিনাম** ঔষধ প্রস্তুত করা হয়। আলসার আর রক্তনির্গমন রোধকল্পে এটা অতি কার্যকর এক ঔষধ। বেশীরভাগ চিকিৎসক এটা খুব অল্পই ব্যবহার করেন; কিন্তু আমি একে অতীব কার্যকর দেখতে পেয়েছি। গ্ল্যান্ডের প্রদাহের কারণে যে সব ফোঁড়া দেখা দেয় সেগুলো বড় শক্ত ধরনের আর ..... হয়ে থাকে। এগুলোতে অতি বিশ্রী ধরনের নীলাভ রঙ দেখা যায়। এগুলোতে ব্যথাও হয় কিন্তু পূঁজ হয় না। এ ধরনের ফোঁড়ার ক্ষেত্রে এনথ্রাসিনাম অব্যর্থ প্রতীয়মান হয়। এক দু'মাস একাধারে ব্যবহার করলে এসব ফোঁড়া ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

দেহের **অভ্যন্তরে বিদ্যমান এমন ঘা** যেগুলো থেকে রক্ত চুয়ে চুয়ে পড়ে আর যেসব আলসারের ক্যান্সারে রূপান্তরিত হবার প্রবণতা রয়েছে এ সমস্ত ক্ষেত্রে এনথ্রাসিনাম কার্যকর সাব্যস্ত হতে পারে। দেহের যেসব অংশে রোগের কারণে ত্বকহীন হয়ে রক্তাভ লাল বর্ণের নীচের অংশ বেরিয়ে আসে সেগুলোর চিকিৎসাতেও এনথ্রাসিনাম খুব উপকারী। এই লক্ষণের আলোকে আমার মনে হয় বৃহদান্ত্রের নিম্নাংশে ulcerative coltis (আলসারেটিভ কোলাইটিস) ব্যাধিতেও এই ঔষধ কার্যকর সাব্যস্ত হবে। এই রোগে অন্ত্রের নিম্নাংশের ঝিল্লীর নরম আর মসৃণ অংশ গলে যায় আর অন্ত্রগুলোর ভেতরের দিক অনাবৃত হয়ে পড়ে আর এগুলো দিয়ে রক্ত ঝরে। এলোপ্যাথিক পদ্ধতিতে এই রোগের কোন নির্দিষ্ট স্থায়ী কোন চিকিৎসা নেই। তাৎক্ষণিক কষ্ট লাঘব করার জন্য যেসব ঔষধ প্রয়োগ করা হয় যেগুলোর নেতিবাচক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও থাকে। তবে অপারেশনের মাধ্যমে যদি অন্ত্রের আক্রান্ত অংশটি কেটে ফেলা হয় তাহলে আরোগ্য লাভ হয় রোগটি আর এগোয় না। একটি রোগকে ভুল ঔষধ প্রয়োগের মাধ্যমে দাবিয়ে দিলে আলসারেটিভ কোলাইটিস হবার সম্ভাবনা থাকে। এ রোগের ক্ষেত্রে এনথ্রাসিনাম Anthracinum কার্যকর হবার কথা; কেননা, এর সদৃশ কিছু রোগে আমি এনথ্রাসিনাম প্রয়োগ করে একে উত্তমরূপে কার্যকর পেয়েছি।

এনথ্রাসিনাম ঘা আর ফোঁড়া নিরাময়ের ক্ষমতা রাখে। দেহে ফোঁড়া আর ফুস্কুরী সৃষ্টি হবার প্রবণতাও এটা রোধ করে। শরীরের যে কোন অংশ থেকে কালো বর্ণের রক্ত নির্গত হলে এনথ্রাসিনাম এক্ষেত্রেও কার্যকর সাব্যস্ত হতে পারে।

| | | |
|---|---|---|
| প্রভাব বিনষ্টকারী | ঃ | এপিস ক্যাম্ফার, কার্বোভেজ, ক্রিওজোট, সাইলেসিয়া ও রাসটক্স |
| সেব্য পটেন্সী | ঃ | ৩০ থেকে ২০০ |

### ঔষধ নম্বর-১৮
### এনথ্রাকোকালি
Anthrakokali

এই ঔষধটি ত্বকের বিভিন্ন স্থানে ফেটে গেলে আর ফোস্কার মত পড়লে এটা ব্যবহার করা উচিত। নাকের ছিদ্র নাকের কিনারা ফাটা আরম্ভ করলে আর সেগুলোতে ঘা সৃষ্টি হলে এনথ্রাকোকালি কার্যকর সাব্যস্ত হয়। এতে মুখ গহ্বর শুষ্ক মনে হয়, গলার অভ্যন্তরেও শুষ্কতা অনুভূত হয়। শুষ্ক পিত্তের আধিক্যের কারণে বমি হয়। পাকস্থলীতে গ্যাস হয়। রোগী ভীষণ পিপাসা বোধ করে। বেশী বেশী পেশাব লাগে।

সেব্য পটেন্সী ঃ ৩০

### ঔষধ নম্বর-১৯
### এনটিমোনিয়ম ক্রুড
Antimonium Crudum
(সুরমা)

পাকস্থলীর ব্যবস্থাপনা বিনষ্ট হয়ে পড়া হলো **এনটিমোনিয়ম ক্রুডের** সবচাইতে উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। এতে জিহ্বার উপর মোটা সাদা রঙের প্রলেপ পড়ে যায়। চিকিৎসকরা 'সাদা' রঙের প্রলেপের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন অথচ কখনো কখনো চকলেট খেলে বা চা পান করলে সাদা প্রলেপ খয়েরী রঙ ধারণ করতে পারে। তাই এনটিমোনিয়ম ক্রুডের সাদা লক্ষণ কখনো কখনো খয়েরী রঙেও পরিবর্তীত হতে পারে। মূল লক্ষণ হলো, জিহ্বার উপর মোটা প্রলেপ দেখা যাবে আর যদি খাদ্যাহারের কারণে রঙ পরিবর্তীত না হয় তা হলে এই প্রলেপের রঙ হবে সাদা। এনটিমোনিয়ম ক্রুড তার সাধারণ লক্ষণ দ্বারা নির্দিষ্ট করা যায়। এর রোগী অনেক বেশী পরিমাণে খাদ্যাহার করে থাকে আর অনবরত খেতেই থাকে। রোগের আক্রমণের পূর্বে রোগীর অসহ্য রকম ক্ষুধা পায়। এর পর অকস্মাৎ যখন পাকস্থলী অকেজো হয়ে যায় তখন পূর্বে উল্লেখিত লক্ষণ স্পষ্টভাবে দেখা দেয়।

এনটিমোনিয়ম ক্রুড বেশ গভীর ও দীর্ঘ প্রভাব বিস্তারকারী ঔষধ। বেশী খাদ্যাহারের কারণে যদি বমির প্রবণতা দেখা দেয় তাহলে এই ঔষধ সেবন করে বমি রোধ করা সম্ভব। এছাড়া পায়ের আঁচিল রোধে এটা বেশ ভাল কার্যকারিতা দেখায়। পায়ের তালুতে শক্ত ফোঁড়ার মত আঁচিল জন্ম নেয়। নোখগুলো বিকৃত হয়ে যায় কিংবা নোখের উপর রেখার

মত দাগ দেখা দেয়। অনেক সময় এই লক্ষণ দেহের অভ্যন্তরের ভিন্ন কোন রোগের লক্ষণ হয়ে থাকে। এনটিমোনিয়ম ক্রুডের রোগীদের নোখ আর আঙ্গুলে আঁচিল সৃষ্টি হয়। নোখ উপড়ে যায় অথবা একেবারেই চ্যাপটা হয়ে লেগে থাকে আর এগুলোতে রেখার মতা দাগ পড়ে।

মোটা মোটা.....ফুলে ওঠে। পায়েও আঁচিল আর গোঁদ দেখা দেয়। দাঁতের মাড়ি ফুলে যায় আর দাঁত থেকে সরে যায়। দাঁতে পোকা ধরে। যদি এসব লক্ষণ স্পষ্ট দেখা দেয় তাহলে এসব এনটিমোনিয়ম ক্রুডের পরিচায়ক। এনটিমোনিয়ম ক্রুড আর এনটিমোনিয়ম টার্টের দাঁত ব্যাথা স্নায়বিক কারণেও হয়ে থাকে।

রক্ত আমাশায় সাধারণতঃ রোগীর বাহ্যের ভেতর রক্তমাখা অবস্থায় দেখা যায়। কিন্তু এনটিমোনিয়ম ক্রুডের বিশেষ দিক হলো এ ক্ষেত্রে রোগীর বাহ্য স্বাস্থ্যবান এক ব্যক্তির বাহ্যের মত সুগঠিত হয়। ভেতরে রক্তমাখা থাকে না কিন্তু বাহ্যের চারিপাশে রক্তের একটা আস্তর থাকে। এনটিমোনিয়ম ক্রুডের রোগী পায়ের গোড়ালীতে ব্যথা অনুভব করে। পাকস্থলীর সমস্যার পাশাপাশি ত্বকের নানা প্রকার রোগ-বালাই দেখা দেয়। খোলা বাতাসে আর আর্দ্র উষ্ণ জলবায়ুতে রোগীর কষ্ট লাঘব হয়। কিন্তু রোগী উত্তাপ একেবারেই সহ্য করতে পারে না; বিশেষ করে, সূর্যের রশ্মি তার কাছে অসহ্য মনে হয়। পাকস্থলীর অচল অবস্থা, মাথা ঘোরা, ফুসফুসের সমস্যা, নোখ আর নাকের ফুটোতে ত্বক ফাটার রোগ, নাকের কোণা আর ঠোঁটের কোণা ছিলে যাওয়া আর শুষ্ক একজিমা এসব এনটিমোনিয়ম ক্রুডের লক্ষণাদির অন্তর্ভুক্ত।

সহায়ক ঔষধ ঃ সালফার
প্রভাব বিনষ্টকারী ঃ হিপার সালফার
সেব্য পটেন্সী ঃ ৩০

অনুবাদঃ **আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী**

**হাড় ভাঙ্গার হোমিও চিকিৎসাপত্র ঃ**

হুযূর বলেছেন ঃ হাড়ে আঘাত লাগলে অথবা হাড়ের ফ্র্যাকচার হলে Ruta (রুটা) প্রয়োগে খুব দ্রুত আরোগ্য লাভ হয়। হাড় এবং এর আশেপাশের স্নায়ুকে 'রুটা' শক্তিশালী করে। 'রুটা'র সাথে Calc.Phos আর Symphytum একত্রিত করে প্রয়োগ করলে এটা আরও কার্যকর একটি ব্যবস্থাপত্র সাব্যস্ত হয়। ক্যালকেরিয়া ফস হাড়ের অভ্যন্তরীণ মজ্জাকে আর সিমফাইট ও রুটা স্নায়বিক পেশীগুলোকে শক্তি প্রদান করে। যদি আঘাতটি টাটকা হয় তাহলে সঙ্গে আর্নিকা ৩০ মিশিয়ে নেয়া উচিত। *['হোমিওপ্যাথি - সদৃশ বিধান চিকিৎসা' পুস্তক, পৃঃ ৭২০]*

# আমাদের চাঁদা
## (১২তম কিস্তি)

**লোকাল (স্থানীয়) ফান্ড ঃ** প্রত্যেক স্থানীয় জামাত নিজেদের সব রকম খরচ নির্বাহের জন্যে স্থানীয় আহমদীদের কাছ থেকে রীতিমত আয়ের **চৌষট্টি ভাগের এক ভাগ** হারে মোকামী ফান্ডে চাঁদা সংগ্রহ করতে পারে। স্থানীয় জামাত এ ফান্ডকে যত শক্তিশালী করতে পারেন ততই স্থানীয়ভাবে জামাতের কাজ-কর্ম করতে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হয়। এ প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয় দৃষ্টি-পটে রাখা যেতে পারেঃ

১। জামাতের অর্থনৈতিক কর্মফান্ডে যারা জড়িত (যেমন, সেক্রেটারী মাল বা সেক্রেটারী লোকাল ফান্ড) জামাতের সদস্যগণের নিকট থেকে মাসিক বা বাৎসরিক আয়ের **চৌষট্টি ভাগের এক ভাগ হিসেবে** লোকাল ফান্ড উসুল করতে পারেন। এর বেশী নয়। আর এ ফান্ডে কেবল তাদের নিকট থেকে আদায় করা যেতে পারে যাদের লাযেমী চাঁদা রীতিমত আদায় করা হয়েছে আর বকেয়া নেই।

২। সেক্রেটারী মাল বা সেক্রেটারী লোকাল ফান্ডের কর্তব্য হবে, তারা প্রত্যেক প্রকারের স্থানীয় আয় ও ব্যয়ের (কেন্দ্রীয় গ্রান্ট/আদায়ের শতকরা ৮% যা কর্তন করে রাখেন তা সহ) একটি বাজেট প্রতি বছর প্রণয়ন করে স্থানীয় মজলিসে আমেলায় উপস্থাপন করে অনুমোদন লাভ করবেন এবং তদনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করবেন। তদুপরি কেন্দ্রীয় নির্দেশ অনুযায়ী এর হিসাব-কিতাব যথারীতি সংরক্ষণ করবেন। ইন্সপেকটর বায়তুল মাল যথারীতি এর নিরীক্ষণ (Audit) করবেন।

৩। যদি কোন জামাতের কোন জামাতী প্রয়োজন মিটানোর জন্যে শর্তানুযায়ী চাঁদার অতিরিক্ত চাঁদা আদায় করতে হয় তাহলে যথারীতি নেযারতে বায়তুল মাল-এর অনুমতি নেয়া আবশ্যক হবে। নেযারতে বায়তুল মালের অনুমতি ও অনুমোদন ব্যাতিরেকে এ ফান্ড উসুল করার অনুমতি নেই।

৪। লোকাল ফান্ডের উসুলীকৃত অর্থ কোন কর্মকর্তার ব্যক্তিগত তহবিলে রাখা যাবে না বরং কোন ব্যক্তির বা পোষ্টাল ডাক বিভাগের হিসাবে জামাতের নামে সংরক্ষণ করতে হবে। মজলিসে আমেলার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সেক্রেটারী মাল বা সেক্রেটারী লোকাল ফান্ড অনুমোদিত অর্থ হিসাব থেকে তুলতে পারবেন। এমন চেকের ওপরে জামাতের প্রেসিডেন্ট/আমীর এবং সেক্রেটারী মালের স্বাক্ষর অবশ্যই থাকতে হবে।

৫। লোকাল ফান্ডের চাঁদা কেন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত রশিদ বইতে আদায় করতে হবে। প্রত্যেক চাঁদা দাতাকে রশিদ দিতে হবে এবং দৈনিক জমা বইতে প্রত্যেক দিন ইহা অবশ্যই রেকর্ড করতে হবে। নিঃসন্দেহে কেন্দ্রীয় খাতসমূহে চাঁদা আদায় করার সময় লোকাল ফান্ডের অর্থ বাদ যাবে।

৬। বিভিন্ন আয় যেমন, কৃষিখাতে, বাগ-বাগিচা থেকে আয়, বাড়ী ভাড়া বা দোকান ভাড়া (যা স্থানীয় মসজিদ বা জামাতের নামে সরকারী রেকর্ডভুক্ত আছে বা স্থানীয় জামাত স্বয়ং জামাতের নামে করে রেখেছে) এর আয়কে রীতিমত ও সময়মত আদায় করা ও একাউন্টে জমা করা আবশ্যক । আর ইহা বিনা অনুমতিতে খরচ করা যাবে না।

৭। সংশ্লিষ্ট জামাতের আমীর বা প্রেসিডেন্টের জন্যে ইহা আবশ্যক যে, প্রত্যেক আর্থিক বছরের শেষে ঐ বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করার পরে মজলিসে আমেলায় পেশ করেন এবং উহা রেকর্ডভুক্ত করেন। কোন কোন জামাত যেহেতু এ নির্দেশ যথারীতি পালন করে না যার জন্যে সাধারণতঃ জামাতের সদস্যগণের আপত্তি করার সুযোগ লাভ হয় এবং এর ফলে জামাতের সদস্য ও কর্ম-কর্তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়ে জামাতী কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। তাই ইহা মান্য করা খুবই জরুরী।

৮। লোকাল ফান্ডের অর্থ নিম্নলিখিত খাতে ব্যয় করা যেতে পারে ঃ

১। স্থানীয় তা'লীম ও তরবিয়তি কর্মফান্ড, ২। কোন গরীব অসুস্থ ভাই-বোনকে সাহায্যস্বরূপ, ৩। কোন লা-ওয়ারীস বা অক্ষম ব্যক্তির দাফন-কাফনের প্রসঙ্গে, ৪। মেহমান নেওয়াযী ৫। ইমামুস সালাত বা মসজিদের খাদেমকে সাহায্যস্বরূপ, ৬। চাঁদা আদায় কার্যে স্থানীয় ভাবে খরচ, ৭। স্থানীয় মসজিদের বিদ্যুৎ, পানি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি বাবদ খরচ।

**কেন্দ্রীয় গ্রান্ট**

যদি স্থানীয় জামাত বড় হয় আর বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে উহার স্থানীয় খরচ অধিক হয় বা বিশেষ কারণ দেখা দেয় তাহলে এমতাবস্থায় বায়তুল মাল জাতীয় জামাত এসব জামাতের জন্যে কিছু গ্রান্ট কেন্দ্রীয় চাঁদার খাত থেকে মঞ্জুরী দেবার চিন্তা করবে। কিন্তু এমন গ্রান্ট মঞ্জুর হবার পরেও বায়তুল মালের এ অধিকার থাকবে যে, উহা স্থানীয় জামাত কর্তৃক কেন্দ্রীয় চাঁদার খাতে আদায়, স্থানীয় খরচাদি ও কেন্দ্রীয় সামর্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে গ্রান্ট অব্যাহত রাখতে পারে বা কম ও বেশী করতে পারে।

এদিক থেকে বায়তুল মাল বা জাতীয় জামাত কে স্থানীয় খরচাদির জন্যে গ্রান্ট দেয়ায় কেন্দ্রীয় ফান্ড যেন দুর্বল না হয়ে যায়। তদুপরি এজন্যে যে, সদস্যগণের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি ও পরোপকারের আবেগ এবং কাজ করার আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে জানা যেতে পারে। এটা আবশ্যক যে, গ্রান্টের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বের বায়তুল মালের নাযের / জাতীয় জামাত সত্যায়ন করেন যে, স্থানীয় জামাতের সকল সদস্য সঠিক আয়ের ওপরে যে চাঁদা অবশ্য আদায় হিসেবে এ জামাতের স্কন্ধে অর্পিত হয়েছে উহার শতকরা ৮০ ভাগ আদায় হয়ে বায়তুল মালে জমা করা হয়েছে। শতকরা ৮০ ভাগ দ্বারা স্থানীয় জামাতের বাজেটের ৮০ ভাগ বুঝায় না; বরং এর চাঁদা দেয়ার প্রকৃত সামর্থ্যের শতকরা ৮০ ভাগ বুঝায়। চাঁদা আম ছাড়াও গ্রান্ট দেয়ার সময়ে এ বিষয়ের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সালানা জলসার যতটা চাঁদা ঐ জামাতের স্কন্ধে অর্পিত হয়েছে তাথেকেও কমপক্ষে শতকরা ৮০ ভাগ আদায় হয়ে গেছে।

কেন্দ্র যে স্থানীয় জামাতের জন্যে গ্রান্ট নির্ধারণ করে ঐ জামাতের জন্যে ইহা আবশ্যক যে, উহা স্বীয় স্থানীয় খরচাদির বাজেট কেন্দ্রের মঞ্জুরীর জন্যে মজলিসে শূরার ২ মাস পূর্বে পাঠায় যেন কেন্দ্র চিন্তা-ভাবনা করে এর যথাযথ মঞ্জুরীকৃত অংশ বাৎসরিক বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। সাধারণ অবস্থায় কেন্দ্রীয় ফান্ড থেকে যতটা আয় স্থানীয় বাজেটে দেখানো হয়েছে কমপক্ষে এতটাই স্থানীয় চাঁদার আদায়ও হওয়া বাঞ্ছনীয় যেন এ অনুমান করা যেতে পারে যে, স্থানীয় জামাত নিজেদের লোকাল ফান্ডের প্রয়োজন মিটাতে স্থানীয়ভাবে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে।

**কুরবানীর চামড়া ঃ**

কুববানীর চামড়া বিক্রয় করে যে অর্থ পাওয়া যায় উহাকে এখন কেন্দ্রীয় আয় মনে করা হয় না; বরং জামাতগুলোর জন্যে ইহা স্থানীয় ফান্ডের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়ার অনুমতি রয়েছে।

**অংগ সংগঠনগুলোর চাঁদা**

উপরোক্ত চাঁদা ব্যতিরেকে অংগ সংগঠনগুলোর কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়ার জন্যেও প্রত্যেকের আলাদা আলাদা চাঁদা রয়েছে। প্রত্যেকটি সংগঠন সময়ের চাহিদা অনুসারে নিজেদের শূরার (পরামর্শের) মাধ্যমে চাঁদার হার নির্ধারিত করে যুগ-খলীফার অনুমোদন নিবে। পরে এ চাঁদাগুলোও আদায় করা প্রত্যেক সংগঠনের সদস্যদের জন্যে জরুরী। অংগ সংগঠনের চাঁদা রীতিমত আদায় না করলেও একজন সদস্য জামাতের ভোটার হতে পারবেন না যদিও তার জামাতী চাঁদা আদায় হয়ে থাকুক না কেন। এখন অংগসংগঠনগুলোর চাঁদা নিয়ে আলোচনা করছিঃ

**মজলিসে আনসারুল্লাহ্ ঃ**

১। **মজলিস চাঁদার হার**-মাসিক আয়ের ১% (শতকরা ১ ভাগ) মাসিক দেয়।

২। **কেন্দ্রীয় ইজতেমার চাঁদার হার**-মাসিক আয়ের ১.৫% (শতকরা ১.৫ ভাগ) সারা বছরে দেয়।

৩। **ইশাআত এর চাঁদার হার**-এক হাজার টাকার নিম্ন মাসিক আয়ের আনসারদের ২৪/= সারা বছরে দেয়। ১০০০ টাকা এবং তদূর্ধ্বে আনসারদের ৭৫/= টাকা সারা বছরে দেয়।

**লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঃ**

১। **উপার্জনশীল লাজনা**-মাসিক আয়ের ১% সদস্যা চাঁদা হিসেবে মাসে দেয়। মাসিক আয়ের ১.৫% **ইজতেমা চাঁদা** সারা বছরে দেয়। ৪০/= **খেদমতে খালক** সারা বছরে দেয়।

২। **অনুপার্জনশীল লাজনা**-মাসে কমপক্ষে ৩.০০ **সদস্য চাঁদা দিবেন**। মাসে কমপক্ষে ২.০০ **ইজতেমা চাঁদা দিবেন**। মাসে কমপক্ষে ১.০০ **খেদমতে খালক চাঁদা** দিবেন।

সামাজিক ও পারিবারিক মর্যাদাসম্পন্ন মহিলারা স্ব স্ব অবস্থানুযায়ী এ সব খাতে সাধ্যানুযায়ী চাঁদা দিবেন।

**নাসেরাতুল আহমদীয়া**

প্রতি মাসে দিবেন ঃ ১। **সদস্যা চাঁদা** ১.০০ করে

২। **ইজতেমা চাঁদা** ০.৫০ করে ৩। **খেদমতে খালক চাঁদা** ০.৫০ করে।

এতদ্ব্যতিরেকে সামাজিক ও পারিবারিক মর্যাদা-সম্পন্ন নাসেরাতগণ নিজ নিজ অবস্থানুযায়ী এসব খাতে সামর্থ্যানুযায়ী চাঁদা দিবেন।

**মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া ও আতফালুল আহমদীয়া ঃ**

**ক) মজলিস চাঁদা খোদ্দাম ঃ** ১) উপার্জনশীল খাদেমের নিকট হতে তার মাসিক আয়ের একশ' টাকায় এক টাকা হিসাবে মাসিক মজলিস চাঁদা আদায় করতে হবে।

২) অনুপার্জনশীল ছাত্রদের নিকট হতে মাসিক ৩.০০ টাকা হিসাবে চাঁদা আদায় করতে হবে।

**খ) মজলিস চাঁদা আতফাল ঃ** ১) প্রত্যেক তিফলের নিকট হতে মাসিক ১.০০ টাকা হিসাবে চাঁদা আদায় করতে হবে।

**গ) বার্ষিক ইজতেমার চাঁদা (খোদ্দাম) ঃ** ১) উপার্জনশীল খাদেমের নিকট হতে মাসিক আয়ের প্রতি একশ' টাকায় ইজতেমার চাঁদা ৫.০০ টাকা ১ বৎসরে আদায় করতে হবে।

২) অনুপার্জনশীল ও ছাত্রদের নিকট হতে ১৫.০০ টাকা ১ বৎসরে আদায় করতে হবে।

**ঘ) বার্ষিক ইজতেমার চাঁদা (আতফাল) ঃ** ১) প্রত্যেক তিফলের নিকট হতে ১ বৎসরে বার্ষিক ইজতেমার চাঁদা ৮.০০ (আট) টাকা আদায় করতে হবে।

**ঙ) বার্ষিক কেন্দ্রীয় তা'লিম তরবিয়তী ক্লাস ও প্রকাশনা ঃ**

**খোদ্দাম ঃ** ১) উপার্জনশীল খাদেমের নিকট হতে তার এক মাসের আয়ের উপরে শতকরা ০.৫০ টাকা হিসাবে বার্ষিক কেন্দ্রীয় তা'লীম তরবিয়তী ক্লাস ও প্রকাশনা খাত দু'টিতে আলাদা আলাদাভাবে একই হারে আদায় করতে হবে।

২) অনুপার্জনশীল ও ছাত্রদের নিকট হতে ১ বৎসরে ২.০০ টাকা হিসাবে বার্ষিক কেন্দ্রীয় তা'লীম তরবিয়তী ক্লাস ও প্রকাশনা খাত

দু'টিতে আলাদা আলাদাভাবে আদায় করতে হবে।

**আতফাল ঃ** প্রত্যেক তিফলের নিকট হতে ১ বৎসরে ১.০০ টাকা হিসাবে কেন্দ্রীয় তা'লীম তরবিয়তী ক্লাস ও প্রকাশনা খাত দু'টিতে আলাদা আলাদাভাবে আদায় করতে হবে।

**কেন্দ্রের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন চাঁদা আদায় করা যাবে নাঃ**

এ প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর নির্দেশ এই যে,

"যতটা আমি বুঝতে পেরেছি ইহা কোন নতুন প্রস্তাব নয়। এ প্রসঙ্গে পূর্বেও আমি ঘোষণা করছি যে, জামাতে চাঁদা আদায় করার জন্যে কোন ব্যক্তির অনুমতি নেই যতক্ষণ পর্যন্ত না নেযারতে বায়তুল মাল থেকে অনুমতি নেয় বা আমার অনুমতি নেয়; বরং কতকের বিরুদ্ধে আমরা এর ভিত্তিতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি যে, তারা কেন্দ্রের অনুমতি ব্যতিরেকে চাঁদা আদায় করেছে। নাযের সাহেব বায়তুল মালের যদি এ ধরনের কোন ঘটনা জানা থাকে তাহলে তা সদর আঞ্জুমানের সম্মুখে উপস্থিত করা উচিত। যদি সদর আঞ্জুমান দৃষ্টি না দেয় তাহলে আমার সম্মুখে উপস্থাপন করে। যা-ই হোক ইহা কোন নতুন প্রস্তাব নয় যে, এ প্রসঙ্গে আরও কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ প্রস্তাবের উল্লেখ দ্বারা কেবল এতটা উপকার বুঝি যে, এখন আবারও জামাতের জানা হয়ে যাবে যে, এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রের অনুমতি আবশ্যক। আর যখন কোন ব্যক্তি জামাতের ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে চাঁদা আদায় করতে থাকে তখন তার নিকট একটি অনুমতিপত্র থাকা আবশ্যক। এতে এ উল্লেখ থাকবে যে, তাকে নাযের বায়তুল মাল বা যুগ-খলীফার পক্ষ থেকে চাঁদা আদায় করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আজ পর্যন্ত জামাতের রীতি ইহাই যে, যখন জরুরী প্রয়োজন মিটাতে চাঁদা আদায়ের প্রয়োজন দেখা দেয় তখন কেন্দ্রীয় অনুমতি চাওয়া হয় আর যখন কেন্দ্র অনুমতি দেয় তারপরে তারা চাঁদা আদায় করে থাকে। এর উপকার এই যে, চাঁদার ব্যাপারে জামাতের যে পদ্ধতি তা কেবল প্রতিষ্ঠিতই থাকে না বরং অন্যেরাও জানতে পারে যে, এ চাঁদা কেন্দ্রের অনুমতিক্রমে জমা করা হচ্ছে। কেননা, তার নিকট অনুমতি পত্র রয়েছে। অতএব এ প্রসঙ্গে কোন ভোটাভোটির প্রয়োজন নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত বায়তুল মাল অনুমতি না দেয় বা যুগ-খলীফা অনুমতি না দেয় অথচ যদি এর বিপরীতে কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তাহলে তার বিরুদ্ধে সদর আঞ্জুমানে রিপোর্ট করা নাযের বায়তুল মালের কর্তব্য এবং যথোপযুক্ত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করাও কর্তব্য" (রিপোর্ট মজলিশে মুশাভিরাত, ১৯৪৩)।

**বকেয়াদারদের নিরাশ হওয়ার কারণ নেই ঃ**

কোন যুদ্ধাভিযানে একটি বাহিনী যেমন তাদের সঙ্গী রোগগ্রস্ত ও আহত জনকে ফেলে না দিয়ে সাথে বহন করে তেমনি আহমদী জামাতে চাঁদায় যারা দুর্বল তাদেরকে পেছনে ফেলে না দিয়ে তাদেরকেও বিভিন্ন প্রক্রিয়া পদ্ধতিতে চাঁদা দানে সামর্থ্যবান করে তোলার বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করার ব্যবস্থা রয়েছে। সুতরাং যারা মোটেই চাঁদা দেন নি বা বিরাট বকেয়ায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছেন তাদের নিরাশ হওয়ার কারণ নেই। যারা চাঁদা বা-শরাহ্ (শর্তানুযায়ী) আদায় করতে অক্ষম তারা স্থানীয় ও জাতীয় জামাতের মাধ্যমে যুগ-খলীফার নিকট আবেদন করতে পারেন। তাদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলো দৃষ্টির সম্মুখে রাখা আবশ্যক ঃ

১। চাঁদা থেকে সবৈব রেয়াত কোন অবস্থায়ই দেয়া যেতে পারে না। অর্থাৎ ইহা তো হতে পারে যে, কোন ব্যক্তির অপারগতার কারণে তাকে কম হারে চাঁদা দেয়ার অনুমতি দেয়া যেতে পারে। কিন্তু এটা হতে পারে না যে, কোন ব্যক্তি মোটেই চাঁদা না দেয়ার জন্যে অনুমতি প্রার্থনা করতে থাকে। অবশ্য কোন ব্যক্তির যদি মোটেই আয় না থাকে তাহলে স্বতন্ত্র কথা। এমন ব্যক্তির ওপরে কোন চাঁদা বাধ্যকর হবে না। চাঁদা তার ওপরেই বাধ্যকর হয়ে থাকে যার কোন আয় থাকে।

২। চাঁদা কম হারে দেয়ার দরখাস্ত অস্পষ্ট হওয়া উচিত নয়। বরং অপারগতা ও অক্ষমতার বিষয়ে ব্যাখা থাকা আবশ্যক যেন তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। যদি কোন পুণ্যবান ব্যক্তি বাধ্য হয়ে কম হারে চাঁদা দেয়ার আকাঙ্ক্ষা করে তাহলে তাকে অনুমতি দেয়া উচিত। কিন্তু যদি ইহা প্রমাণ হয়ে যায় যে, কেবল নিজের ঈমানী দুর্বলতাকে ঢাকার জন্যে বাহানা অন্বেষণ করছে তাহলে তার সাথে যথোপযুক্ত ব্যবহারই হওয়া উচিত।

৩। কতক লোক না তো পুরো চাঁদা দেয় আবার কম হারে চাঁদা দেবার জন্যে আবেদনও করে না। বরং এমনই বলে যেতে থাকে যে, আমাদের ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখো। আমাদের কেন অযথা পরীক্ষায় ফেলছো! এমন লোকদের বিষয় কখনও খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। আর তাদের ব্যাপারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা থেকে পিছ পা হওয়াও উচিত নয়। যদি জামাতের আদেশ- নিষেধ ও বিধি-বিধানের প্রতি তাদের সামান্যতমও সম্মানবোধ থাকে তাহলে তদনুযায়ী প্রতিক্রিয়া দেখানো কখনও এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

৪। যদি কোন ব্যক্তি কিছু দিন ধরে চাঁদা আম বা জলসা সালানা চাঁদা আদায় করতে অমনোযোগী হয় আবার পরে পুরোপুরিভাবে চাঁদা আদায় আরম্ভ করে দেয় বা কম হারে চাঁদা আদায়ের অনুমতি লাভ করে তদনুযায়ী চাঁদা দিতে থাকে কিন্তু পূর্ব বকেয়া বা এর কিছু অংশ আদায় করতে অপারগ হয় তাহলে পূর্ব বকেয়া রেয়াতের জন্যে চিন্তা-ভাবনা করা যেতে পারে। তবে শর্ত এই যে, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে যে, ভবিষ্যতে এ ব্যক্তি রীতিমত চাঁদা আদায় করতে থাকবেন।

৫। যেসব বন্ধু কম হারে চাঁদা দেবার বা বকেয়া রেয়াতের জন্যে আবেদন করেন, তাদের আবেদন পত্রগুলো স্থানীয় মজলিসে আমেলায় উপস্থাপন করে মজলিসে সত্যায়ন ও সুপারিশসহ জাতীয় কেন্দ্রে পাঠাতে হবে। স্থানীয় মজলিস আমেলা নিম্নোক্ত নির্ধারিত ফরমে সুপারিশ করবেঃ

"আজ..... তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামাত..... এর মজলিসে আমেলার..... তম সভায় এ আবেদন পত্র উপস্থাপন করা হয়েছিলো। সুপারিশ করা যাচ্ছে যে, তাকে ৩২ ভাগের ১ ভাগ/ ৬৪ ভাগের ১ ভাগ/ ১২৮ ভাগের এক ভাগ শর্তে চাঁদা আদায় করার অনুমতি দেয়া হোক। বা/ এবং মং..... টাকা চাঁদা আম বা/এবং ..... টাকা জলসা সালানার চাঁদা পূর্ব বকেয়া রেয়াত দেয়া হোক। এখন এ ব্যক্তি ..... তারিখ থেকে রীতিমত এই কম শর্তে বা পুরো শর্তে চাঁদা আদায় করে যাচ্ছেন। আর আশা করা যাচ্ছে যে, ভবিষ্যতেও চাঁদা রীতিমত আদায় করতে থাকবেন।

এ আবেদন পত্রে মজলিসে আমেলার কমপক্ষে ২জন সদস্যের (অর্থাৎ আমীর/ প্রেসিডেন্ট বা সেক্রেটারী মালের স্বাক্ষর অবশ্যই থাকতে হবে। (চলবে)

**- মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

# আমার জীবন

- শেঠ আব্দুল্লাহ্ আলাদীন

(৪র্থ কিস্তি)

**ধর্মীয় আন্দোলন ও অর্থ ঃ**

আল্লাহ্তাআলা সব সময়েই তাঁর বিশ্বাসী বান্দাদেরই পসন্দ করেন। কিন্তু তিনি ইহা কিছুতেই সহ্য বা পসন্দ করেন না যে, তাঁর বান্দারা মান-সম্মান, জ্ঞান-বুদ্ধি, শক্তি-প্রভাব বা টাকা-পয়সা ইত্যাদি দিয়ে কিছু করার জন্য গর্ব করবে। এই কারণেই পয়গম্বর বা ধর্মীয় সংস্কারক নির্বাচন করার সময় তিনি এমন সব লোক বেছে নেন যাঁরা বিনয়ী, নিরহঙ্কার, সরল এবং অতি সাধারণ। এঁদের কথায় প্রথম প্রথম কেউই কর্ণপাত করে না। কিন্তু ধীরে ধীরে সর্ব-শক্তিমান আল্লাহ্ আপন ক্ষমতা প্রদর্শন করেন এবং তাঁর হাবীবদের দাবীর সত্যতা প্রমাণিত করেন। এভাবেই সর্ব-শক্তিমান এবং সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্তাআলা তাঁর অসীম ক্ষমতা প্রদর্শনের উদাহরণস্বরূপ এ বিনীত অধমকেই বেছে নিলেন সত্য-ধর্ম প্রচার করার জন্য, যদিও ধর্ম সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম না। সেই অজ্ঞ আমি কিই-বা করতে পারতাম সত্য ধর্মের জন্য ? এটা কি একেবারেই অসম্ভব চিত্র নয় যে, আমার ন্যায় একজন অধমকে এমন একটি কাজ করতে হবে যা নাকি এই ধরাপৃষ্ঠে অপর কেউই কোনদিন করতে পারেন নি? নিঃসন্দেহে এটা একটা নেহাৎ পাগলের চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু যিনি এই পৃথিবী এবং সমগ্র নভোমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা এবং যিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী তাঁর জন্য কোন কিছুই অসম্ভব নয়। কারণ আমরা জানি যে, যে কোন জিনিস চোখের পলকেই তিনি সৃষ্টি করতে পারেন, যদি তার ইচ্ছা হয়। মহান ইসলাম ধর্মের আরাধ্য কর্তব্য-কর্ম সম্পাদনের জন্য আমাকে নির্বাচিত করার মধ্যেও তাঁর অপরিসীম ক্ষমতা সুস্পষ্ট প্রমাণ নিহিত রয়েছে।

তাঁর এই নগণ্য বান্দার জীবনটা ধর্মের কাজে উৎসর্গীকৃত হোক এটা আমার প্রতি তাঁর বিশেষ আশীর্বাদ। অন্যদিক দিয়ে চিন্তা করতে গেলে ইহা অতি সহজেই বোধগম্য হবে যে, আমার জন্ম-মুহূর্ত থেকেই তিনি ইহা স্থির করে রেখেছিলেন। ব্যাপারটা আশ্চর্যজনকও বটে! এ কারণেই আমার মাতা-পিতা ঐশী ইংগিতে অনুপ্রাণিত হয়েই আমার নাম রাখেন আবদুল্লাহ্ বা আল্লাহ্র দাস। আরও অসংখ্য লোক আবদুল্লাহ্ নামধারী আছে। কিন্তু পরম দয়ালু খোদা এই আদেশ জারী করলেন যে, আমি প্রকৃত অর্থেই তাঁর ভৃত্য হব। এই ব্যাপারটাকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলার জন্য তিনি অপর এক ঘটনার অবতারণা করলেন। তা হ'ল, একবার এক ব্যারিষ্টার যিনি হিন্দু ধর্ম ছেড়ে প্রকৃত এবং সত্যধর্ম ইসলাম গ্রহণ করেন আমাদের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। একটি বিশেষ মোকদ্দমায় ওকালতি করার জন্যই তিনি এসেছিলেন। তিনি ছিলেন আমার বন্ধু। যে কোন কারণে নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেওয়াতে আমার বন্ধু এসে আমাকে সব বললেন এবং পরামর্শ চাইলেন। আমি বললাম. আল্লাহ্ চান তো আমি আপনাদের এই ব্যাপারটার একটা মীমাংসা করে দেবো, চিন্তা করবেন না। পরে আমি তাদের ব্যাপারটাকে সুন্দরভাবে মিটমাট করে দিই। এর দিন দুই পরে আমার বন্ধু আমাকে বললেন যে, ঝগড়ার আগের দিন তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, অন্য একজনের সাথে তার একটা ঝগড়া বাধে, এবং রামদাস নামে তার এক বন্ধু ওই ঝগড়াটা মিটিয়ে দেন। স্বপ্নের কথা বলার শেষে আবার বললেন যে, স্বপ্নটা আসলে আমাকে নিয়েই দেখেছেন কারণ, রামদাস নামের অর্থ হলো, "ভগবানের দাস বা ভৃত্য, "এবং আমার নামের অর্থও (আবদুল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্র ভৃত্য) আশ্চর্যজনকভাবে দু'টি শব্দ একই অর্থবোধক। বন্ধুর কথা শুনে আমিও আশ্চর্য হয়ে গেলাম। হে আল্লাহ্, তুমিই একমাত্র সকল প্রশংসার মালিক। মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠকাজ হ'ল মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করা। অর্থাৎ, পাপকাজ ও ভ্রান্ত পথ থেকে মানবতাকে পুণ্য কর্মে দীক্ষা দেয়া এবং সৎপথে আহ্বান করা। এই কারণেই আল্লাহ্র প্রিয়, প্রেরিত দূত হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন যে, একজন আলীম বা জ্ঞানী ব্যক্তি এক হাজার পূজারীর চেয়েও ভাল কেননা, সাধারণ পূজারীদের সকল গুণ-আত্মস্বার্থকে কেন্দ্র করেই বিবর্তিত হতে থাকে; কিন্তু একজন আলীমের সৎকাজের ধারার মূলগত ভিত্তি হলো সীমার মধ্যেই অসীম যার দরুন নেতৃত্বদান ও পরিচালনার জন্য সকলেই আলীমদের দিকেই আশা নিয়ে তাকিয়ে থাকে।

অপর এক হাদীসে হযরত (সঃ) বলেছেন, এক হাজার ভাল কাজের পুণ্যের চেয়েও একজন মুজাহিদের একক জেহাদের পুণ্য বেশী; কেননা, মুজাহিদকে নিজের জীবন বিপন্ন করে জেহাদে নামতে হয়, কিন্তু অন্যান্যদের বেলায় জীবন বিপন্ন করার কোন প্রশ্নই উঠে না। এর পরেই আবার রসূল করীম (সঃ) বলছেন, এক জন মুবাল্লিগ বা ধর্ম প্রচারকের স্থান এক হাজার মুজাহিদের সম্মিলিত স্থানের উচ্চে, কারণ একজন ধর্ম প্রচারক অন্যান্য হাজার হাজার মানুষকে পরিচালিত করতে পারেন। এদিক থেকে বিচার করতে গেলে আমি নিজেকে আল্লাহ্তাআলার আশীর্বাদসিক্ত বান্দা বলেই অনুভব করি, কেননা করুণাময় আমাকে সত্য পথ দেখাবার জন্য যাকে নির্দেশ দিলেন তিনি হলেন এ যুগের শ্রেষ্ঠ মুবাল্লিগ।

যে দায়িত্বভার বইবার জন্য আল্লাহ্তাআলা আমাকে নির্বাচিত করলেন সে ভার যাতে আমি সুষ্ঠুভাবে বইতে পারি, সেজন্য শক্তিধরের কাছে প্রার্থনা জানালাম, তা তিনি নিঃসন্দেহে মঞ্জুর করলেন। এর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হলো এই যে, খোদার ইচ্ছানুসারে আমি ইংরাজী, উর্দূ, গুজরাটি এবং অন্যান্য আরও কয়েকটি ভাষায় বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ প্রচারে সমর্থ হলাম। এবং এই সবগুলোই বিশ্বজোড়া সুনাম এবং সুখ্যাতি অর্জন করেছে। আমার লেখা বিভিন্ন বইয়ের দশ থেকে বিশটি পর্যন্ত সংস্করণ বেরিয়েছে। বিশেষ করে আমার লেখা Extracts from the Holy Quran বা 'পাক কালাম থেকে অনুচ্ছেদ সংগ্রহ' নামক ৪০০ পৃষ্ঠার বই খানার এ পর্যন্ত ১২টি সংস্করণ বেরিয়েছে এবং এ বইখানা আমাকে যে শুধু এ নশ্বর পৃথিবীর খ্যাতিই দিয়েছে তাই নয়; তা আমাকে বেহেশ্তেও খ্যাত করেছে ও বেহেশ্ত থেকে বইখানার জন্য আমি উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছি, যার প্রমাণ পাওয়া যাবে ১৯২৭ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে লন্ডন থেকে হযরত ইরফানী সাহেব কর্তৃক আমাকে লিখিত এই চিঠি খানা থেকে ঃ

"আপনাকে মোবারকবাদ জানাবার জন্যই আজ এই চিঠি লিখছি। বিগত ১২ই তারিখে রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখলুম, আমাদের প্রথম

খলীফা (আল্লাহ্ তাঁকে শান্তিতে রাখুন) আপনার পাক কালামের অনুচ্ছেদ নামক বইটির ভূয়সী প্রশংসা করছেন এবং আমাকে তিনি বললেন, হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) ও এই বইখানার যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। আপনার বইখানা আমি অবশ্য এখন পর্যন্ত দেখি নি। শেষ কালে তিনি কথায় কথায় এই মন্তব্য প্রকাশ করলেন যে, আপনার কার্যে বিরোধিতা করে আপনার ভাইয়েরা ভুল ও অন্যায় করছে। তিনি আমাকে আরও বললেন, আপনার ভাইয়েরা যদি আপনার বিরোধিতা থেকে বিরত না হয় তাহলে সেটা তাদের জন্য অতীব দুঃখের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। যা হোক, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনার উক্ত গ্রন্থখানা বেহেশতের সমর্থন পেয়েছে এবং আল্লাহ্ চান ইহা এই পৃথিবীতেও প্রেরণার উৎস হিসাবে জনপ্রিয়তা লাভ করবে।"

এই বেহেশ্‌তি ইংগিতের অন্যতম বিশেষ অর্থ এই যে, আহমদীয়ত হ'ল সত্যিকার ধর্ম। এই কারণেই আল্লাহ্ তাঁর খলীফার মাধমে এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করলেন যে, আমার এ দুই সহোদরের পক্ষে আহমদীয়তের বিরুদ্ধাচারণ করা অন্যায় ও ভুল হচ্ছে এবং এ বিরুদ্ধাচারণ থেকে তারা যদি বিরত না হয় তা'হলে তাদেরই জন্য সেটা অমঙ্গল হবে। এই ঘটনা থেকেই প্রত্যেক পাঠকও বুঝতে পারবেন যে, আহমদীয়ত আল্লাহ্‌তাআলারই ধর্ম এবং এই সত্য ধর্ম গ্রহণ না করলে পাঠককেও পরে অনুতাপ করতে হবে।

মুসলমানদের অগ্রগতির উপায় এই শিরোনামায় আমি উর্দূ ভাষায় একখানা বই লিখেছিলাম। বইটি এত বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, এ পর্যন্ত এর সর্বমোট ২১টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বইটি লেখার পরে একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি এম, এ, ডিগ্রী লাভ করেছি। সত্যিকারভাবে কিন্তু আমি ম্যাট্রিকুলেটও নই এম,এ, তো দূরের কথা। সেই বইটার পরিপ্রেক্ষিতেই যখন আমি এরূপ স্বপ্ন দেখলাম তখন আমার কোন সন্দেহ রইল না যে, স্বয়ং আল্লাহ্‌তাআলাই আমাকে এই এম, এ, ডিগ্রী প্রদান করেছেন। আমি সব সময় আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা জানাতাম, "হে খোদা, তুমি আমাকে তৌফীক দাও যেন আমি ধর্মের সেবা করে যেতে পারি যা তোমার অনুমোদন লাভ করবে।" আল্লাহ্ কর্তৃক আমাকে এম, এ, ডিগ্রী প্রদান ইহাই প্রমাণ করে যে, আমার প্রার্থনা তিনি মঞ্জুর করেছেন। হে পরওয়ারদেগার,সমস্ত প্রশংসাই তোমার।

আমি আগেই বলেছি, স্যার আগাখানের শিষ্য হিসাবে নামায, রোযা ইত্যাদি ইসলামী অনুশাসন আমাদের পালন করতে হ'ত না। কিন্তু আহমদীয়ত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মধ্যে অনেক বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটে গেল। আমাদের বাড়ীতে প্রত্যেক দিন পাঁচবার করে আযান দেয়া হতো এবং আমি নিজেই পাঁচবেলা নামাযে ইমামতী করতাম। প্রতি দিন আমি ৬২ রাকাআত নামায পড়তাম। তা ছাড়া আমি সকালে একঘন্টা, সন্ধ্যায় একঘন্টা অতিবাহিত করতাম আল্লাহ্‌র নবীর স্মরণে এবং রমযানের সব ক'টি রোযা রাখতাম। আগে সব সময়ে একদিন অন্তর অন্তর আমি রোযা রাখতাম। কিন্তু এখন বার্দ্ধক্যহেতু প্রতি বৃহস্পতিবারই শুধু রোযা রেখে থাকি। ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে সব সময়ই আমরা বাইতুল মাল বা কেন্দ্রীয় অর্থশালায় আমাদের যাকাত পাঠিয়ে দিতাম। করুণাময়ের দয়ায় ১৯২১ সালে আমার পরিবারের সকল সদস্যসহ আমি হজ্জ করে আসি। আহমদীয়তের মূলকথা হ'ল এই ঃ প্রত্যেককে নিজের ধ্যান-ধারণা এবং কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অনুভব করতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলছেন, "বিশ্বাসীদের জীবন এবং সম্পত্তি আমি ক্রয় করে নিয়েছি, যার জন্য পরজগতে আমি তাদের পুরস্কৃত করব।" আল্লাহর প্রতি আনুগত্যে একথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, আমরা আমাদের সম্পত্তির রক্ষাকর্তা ছাড়া আর কিছুই নই। ওসবের মালিক আল্লাহ্ স্বয়ং। তা'ছাড়া এ-ও আমাদের মনে রাখা দরকার যে, আমাদের সঙ্গে দু'জন ফিরিশ্‌তা সব সময়েই অবস্থান করছেন এবং আমাদের কাজের খুঁটি-নাটি বিবরণ লিখে রাখছেন যার পরিপ্রেক্ষিতে পরজগতে আমাদের ভাগ্য নির্দ্ধারিত হবে।

আমাদের আরও মনে রাখা প্রয়োজন যে, আল্লাহ্ সবকিছুই শুনেন এবং দেখেন এবং তিনি শুধু "রহমানুর রহীম" ই নন, বরং "শাদীদুল ইকাব" ও (চরম শাস্তিদাতা)। সুতরাং আমাদের অন্তরে সব সময় আল্লাহ্‌র ভয় রাখা প্রয়োজন যাতে আমরা কোন খারাপ কাজ না করি। আল্লাহ্ বলছেন, "যে আমাকে ভয় করে মেনে চলবে তার জন্য আমি দু'টো বেহেশ্‌ত রেখেছি"। এই দুই বেহেশ্‌তের প্রথমটি হলো এ জগতে এবং দ্বিতীয়টি হলো পরজগতে। এসব হ'ল কতগুলো আনুষ্ঠানিক কর্ম যা আহমদীয়ত আমাদেরকে মেনে চলতে বলে। (চলবে)

অনুবাদ - **মৌঃ আবূ মোহাম্মদ সাহাবুদ্দীন**

## শুভ বিবাহ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের সহস্রাব্দের প্রথম জলসায় গত ১৯-০২-২০০১ রোজ রবিবার ১০৩, পূর্ব তেজতুরী বাজার, ঢাকা-১২১৫ নিবাসী জনাব খন্দকার কমদার আলী সাহেবের ছোট ছেলে জনাব খন্দকার ইমতিয়াজ উদ্দীন আহমেদ (নাঈম)-এর সাথে ১৩৯/১, উত্তর মুগদাপাড়া, ঢাকা নিবাসী জনাব এ. কে. এম. আতাউর রহমান সাহেবের বড় মেয়ে শারমিন আক্তার (শিখা) এর বিবাহ ১,০০০০১ (এক লক্ষ এক) টাকা মোহরানা ধার্যে সম্পন্ন হয়।

বিবাহের এলান করেন মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেব, সদর মুরব্বী। বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী এবং পশ্চিম বঙ্গ ও আসামের প্রাদেশিক আমীর মোহাম্মদ মাশরেক আলী মোল্লা সাহেব। ছেলের বাবা শাহ্‌বাজপুরের প্রবীণ ও প্রথম সারির আহমদীগণের একজন এবং ছেলের নানা সরাইলের মরহুম মীর ওসমান আলী। বিয়ের রুখসতানা অনুষ্ঠান গত ১১/৫/২০০১ তারিখ রোজ শুক্রবার মালিবাগ কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। তাদের বিয়ে যেন বরকতময় হয় সেজন্য জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

- **মোহাম্মদ এহসানুল হাবীব (জয়)**

# আহমদী জামাতে শূরার ব্যবস্থাপনা

চৌধুরী হামীদুল্লাহ
ওয়াকীলে আলা, তাহ্‌রীকে জাদীদ

(ষষ্ঠ কিস্তি)

**শূরায় অংশগ্রহণকারীদের অবশ্য করণীয় ঃ**

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) ১৯২২ সনের মজলিসে মুশাভিরাতে ১৪টি মৌলিক পথ-নির্দেশনা দেন। এতে শূরায় অংশগ্রহণকারীদের জন্যে অবশ্যকরণীয় মৌলিক নীতিমালা প্রতিভাত হয়। এসব পথ-নির্দেশনা সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

১।... কেবল আল্লাহ্‌র জন্যেই অংশগ্রহণ করে।

২।.. খোলা মন নিয়ে দোয়া করে অংশ নেয়। ব্যক্তিগত বিষয়াদি অন্তর থেকে বের করে দেয়।

৩।... নিজের অভিমতকে চাপিয়ে দেবার উদ্দেশ্য না হয়। যে কারও মতামত কল্যাণপ্রদ হতে পারে।

৪।... কারও খাতিরে অভিমত না দেয়।

৫।... অন্য কোন প্রজ্ঞার প্রভাবাধীন মতামত না দেয় বরং ইহা দৃষ্টিপটে থাকে যে, যে প্রশ্ন উঠেছে তার জন্যে কোন্ কথা কল্যাণজনক।

৬।... সত্য কথা স্বীকার করতে কুণ্ঠা বোধ না করে, যে কেউ তা উপস্থাপন করুক না কেন।

৭। ...তড়িঘড়ি করে যেন অভিমত না দেয়া হয়। আর অন্যের কথার ওপরে ভিত্তি করে অভিমত না দেয়া হয়।

৮।... নিজস্ব মতামতকে সুদৃঢ় ও নির্ভুল মনে না করে। কখনও কখনও সাধারণ মানুষের মতামতও সঠিক ও কল্যাণজনক হতে পারে।

৯।...আবেগের দাসত্ব করা উচিত নয়। বরং সর্বদা প্রকৃত বিষয়কে স্মরণ রাখা উচিত। অবশ্য আবেগসমূহকে সমর্থনকারী হিসেবে উপস্থাপন করা ও কল্যাণ লাভ করা বৈধ।

১০।... ঐসব কথা বলা হয় যাতে ধর্মীয় কল্যাণ বেশী।

১১।... অভিমত যেন ভুল না হয় এবং শত্রুর মোকাবেলায় উচ্চ প্রভাব সৃষ্টিকারী ও শক্তিশালী হয়।

১২।... শাখা-প্রশাখা নিয়ে বিতর্ক করা ঠিক নয় বরং প্রকৃত ব্যাপারটি দেখা দরকার যে, কল্যাণপ্রদ না ক্ষতিকারক।

১৩।... কোন বিশেষ কথা ব্যতিরেকে কেবল পুনরাবৃত্তির জন্যে দাঁড়ানো উচিত নয়। ইহাও আবশ্যক নয় যে, সবাই কথা বলে।

১৪।... নিজের ও অন্যের সময়কে বাঁচানো উচিত।

(রিপোর্ট মজলিসে শূরা, ছাপা ১৯২২, পৃষ্ঠা-৮-১৩)

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) এসব পথ-নির্দেশনা প্রত্যেক মজলিসে শূরার জন্যে অবশ্য-পালনীয় বলে নির্ধারণ করেছেন। এতদ্ব্যতিরেকে বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সময়ে সময়ে যে নির্দেশাবলী দেয়া হয়েছে নিম্নে তারও উল্লেখ করা হলো ঃ

১।..."প্রত্যেক পরামর্শদাতা 'ইস্তিগফার' করতে করতে যেন উপস্থিত হন অর্থাৎ যেন আধ্যাত্মিক ভাবে ওযূ করে নেন।"

২।... "প্রত্যেক পরামর্শদাতা নিজ পুণ্যগুলোকে স্মরণ করে আর খোদার সমীপে সিজদাবনত হয় এবং সৌন্দর্যমন্ডিত হয়ে খোদার নিকট উপস্থিত হয়"।

৩।..."প্রত্যেক পরামর্শদাতা যখন কিছু পরামর্শ দিয়ে বসে তখন আবার এ আবেদন করে ঃ আমরা পরামর্শ তো দিয়ে দিলাম এখন গ্রহণকারী গ্রহণ করুন বা না করুন আমরা সন্তুষ্ট আছি। এ প্রেরণা নিয়ে যদি আপনারা মজলিসে শূরাতে উপস্থিত হয়ে থাকেন এবং উহার উচ্চ মূল্যবোধকে জীবিত রাখেন তাহলে আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি, মজলিসে শূরা জামাতের মূল্যবোধকে হেফাযত করতে ও জামাতের সদা জীবনের জামীনে পরিণত হবে" (১৯৯৩ সনের ৩০ এপ্রিল প্রদত্ত জুমুআর খুতবা)।

৪।... "যখন মজলিসে শূরাতে যোগদান করেন তখন আপনি দুর্বলতার প্রতি দৃষ্টি রাখুন এবং সবচে' বড় দুর্বলতা হলো আমিত্বের দুর্বলতা। আপনাকে আপনার আত্মা বার বার ধোঁকা দিবে। আপনাকে ঔদ্ধত্য শিখাবে, আপনাকে আপনার দুর্বল, স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ভাইয়ের প্রতি হাসাতে উদ্বুদ্ধ করবে। হেয় প্রতিপন্ন করতে বাধ্য করবে, ত্রুটিপূর্ণ দলীল-প্রমাণ উপস্থাপনকারীকে ঠাট্টা-মস্করা করতে প্ররোচিত করবে। কয়েক প্রকার শয়তানী প্ররোচনা রয়েছে, যা এরূপ সভা যেখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির ওপরে চিন্তা-ভাবনা হয়ে থাকে সেখানে মানুষের অন্তর ও মস্তিষ্কসমূহে দখল নিয়ে বসবে আর এগুলো এমন প্ররোচনা যা কিনা জাতিসমূহকে পথভ্রষ্ট করার কারণে পরিণত হয়ে থাকে। অতএব মজলিসে শূরাতে এসব প্ররোচনা থেকে ইস্তিগফার ও ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে নিজেদেরকে হেফাযত করে" (১৯৯৩ সনের ৩০শে এপ্রিল প্রদত্ত জুমুআর খুতবা)।

৫।... "ঐ মনগুলো যা আপসে সংবদ্ধ হয় তাদের পরামর্শই আসল পরামর্শ। পরামর্শ উহাই হয়ে থাকে যা মন থেকে উঠে আসে, যা পরস্পরে ভালবাসে, প্রীতির সৃষ্টি করে, প্রকৃত সহমর্মিতার সাথে পরামর্শ দেয়"(জুমুআর খুতবা, ১৫-৪-১৯৯৪)।

৬।... "নিজের পরামর্শগুলো বিশ্বস্ততার সাথে দিবেন। আর বিশ্বস্ততার সাথেই স্বীয় বক্ষে ধারণ করে চলে যান। এমনসব বিষয় প্রকাশ করুন যা সাধারণভাবে প্রকাশ করার জন্যে মজলিসে শূরা বা মজলিসের সভাপতি নির্দেশ দেন। আপনাদের ওপরে খোদার পক্ষ থেকে অর্পিত বিশ্বস্ততা আপনার অন্তরে সংরক্ষিত হওয়া আবশ্যক" (জুমুআর খুতবা, ২৯-৪-১৯৯৪)।

৭।..."জামাতে আহমদীয়ার শূরার পরিবেশ পবিত্র। এখানে সকল সত্তার একটি প্রাণের আকারে পরিণত হয়ে যাওয়া এবং বড়ই ভালবাসা ও খোদা- ভীতির সাথে স্বীয় দায়িত্ব পালন করা এর একশ' ভাগের এক ভাগও আপনি অন্য কোথাও দেখতে পাবেন না" (জুমুআর খুতবা, ১৫-৪-১৯৯৪)।

৮। ..."এমন কোন কথা বলবেন না যা এক ভাই-এর মনঃকষ্টের কারণ হয়"।

৯।..."যেখানে সভাপতি আপনাকে থামতে বলেন, সেখানেই থেমে যাবেন। এতেই কল্যাণ। এতেই একটি মর্যাদাপূর্ণ ব্যবস্থাপনা দৃশ্যমান হয়।"

১০।... "একে অপরের বিরুদ্ধে কথা বলবেন না, একে অপরের উদ্ধৃতি দেয়ারও প্রয়োজন নেই।"

১১।..."যে দলীল মনে আসে সে দলীল উপস্থাপন করুন। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বলুন ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করুন"

১২।..."যে সম্বন্ধে সন্দেহ সৃষ্টি হয় সে সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে নিন পদ্ধতিটি কী হবে?"

১৩।..."অনুমতি না নিয়ে বাইরে যাবেন না"।

১৪।..."মতভেদ সংক্রান্ত নোট না লিখিয়ে আসলে সাব কমিটির সদস্য- কমিটির পক্ষে বলবেন"।

১৫।...."প্রস্তাবের ওপরে নিজের চিন্তা-ধারা সম্বন্ধে বলার জন্যে নাম চাইলে নিজের নাম লিখিয়ে দিন"।

১৬।..."(সাব কমিটির জন্যে) অন্যের দ্বারা নিজের নাম উপস্থাপন করানো দোষণীয়। যদিও কেউ নিজের নাম বা অন্য কারও নাম উপস্থাপন করে তাহলে দোষণীয় নয়" (৮ থেকে ১৬ নং মজলিসে শূরা উপলক্ষ্যে ৯-৯-১৯৯৬ তারিখে বেলজিয়ামে প্রদত্ত ভাষণ)।

১৭।..."যাদের নিকট থেকে খলীফা পরামর্শ চান, তাদের কর্তব্য তারা যেন বিশ্বস্ততার সাথে সঠিক পরামর্শ দেন আর যখন পরামর্শ চাওয়া হয় তখন কারও বিরুদ্ধে মতামত থাক না কেন বলে দিন; কিন্তু অন্তরে এ ধারণা করবেন না যে, যদি আমার কথা না গ্রহণ করা হয় তাহলে ভুল হবে।"

১৮।..."যদি আপনি ইসলামী শিক্ষার ওপরে আমল করেন তাহলে বর্ণবাদকে আপনার চৌকাঠের নিকটও আসতে দিবেন না। ঐ বিষের সাথে আধ্যাত্মিকতার সাথে সর্বদা সংঘাত। বর্ণবাদ ও আধ্যাত্মিকতা কখনও এক সাথে বেড়ে উঠতে পারে না" (জুমুআর খুতবা, ১৫-৪-১৯৯৪)।

১৯। "শূরার নির্বাচিত সদস্যদের উপস্থিত থাকা একান্ত জরুরী। একবার হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) বললেন ঃ শূরার যেসব সদস্য এখন এ অধিবেশনে উপস্থিত নেই তাদের খোঁজ করা হোক যে, তারা কারা আর তাদেরকে ভবিষ্যত শূরার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হোক" (রিপোর্ট মুশাভিরাত, ১৯৫৮, পৃষ্ঠা ৩২)।

২০। ..."হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) ১৯৪০ সনের মজলিসে শূরার উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, "অতএব আমি জামাতকে আপনাদের মাধ্যমে এ বাণী পৌছাচ্ছি যে, খোদাতাআলার যে কাজ তা তো অবশ্যই তিনি পূর্ণ করবেন; কিন্তু আমাদের সাথে যে কাজ সম্পর্কিত যদি আমরা বিশ্বস্ততার সাথে সে কাজ সম্পন্ন না করি তাহলে আল্লাহ্তআলার আশিস-সমূহের অবতরণে বিলম্ব হবে। অতএব নিজেদের দায়িত্বাবলী সম্বন্ধে সচেতন হও এবং প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে সর্বদা যোগ্য লোককে নির্বাচিত করো। আমি যতটা বুঝতে পেরেছি, আমার ধারণা এই যে, জামাত শূরার গুরুত্ব এখনও উপলব্ধি করতে পারে নি। তারা একে কেবল একটি সমাবেশ মনে করেছে। যার সম্বন্ধে তারা মনে করে যে, যদি এতে তারা নিজেদের জামাতের প্রতিনিধি প্রেরণ না করেন তাহলে তাদের জামাতের সম্মান হানি ঘটবে এ জন্যে তারা পরিপূর্ণ চিন্তা ভাবনা না করেই প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন" (রিপোর্ট মুশাভিরাত, ১৯৪০ উদ্বোধনী ভাষণ)।

২১।... হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) ১৯৭৩ সনের মুশাভিরাতে বলেনঃ

" প্রত্যেকের অবশ্য কর্তব্য, যে ভাল কথাই তার মস্তিষ্কে উদিত হয়, কোন ভাল প্রস্তাব মনে আসে তো উপস্থাপন করে। ইহা খোদাতাআলার আশিস যে, প্রতিনিধিদের মধ্যে কপটতার কোন ব্যরাম নেই" [রিপোর্ট মজলিসে মুশাভিরাত (ছাপা হয় নি) ১৯৭৩]।

২২।... পুনরায় বলেন ঃ

"কথা সাহসিকতার সাথে বলুন আর অবশ্যই বলুন কিন্তু সংক্ষেপ ও প্রাসঙ্গিক করুন। অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের ওপরে মতামত দিবেন না" [রিপোর্ট মজলিসে মুশাভিরাত, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ২৩ (ছাপা হয় নি)]।

২৩।... হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) ১৯৮৪ সনে মজলিসে শূরায় বলেনঃ

"যেসব সদস্য নিজস্ব ধ্যান-ধারণা উপস্থাপন করতে চান তারা হয়তবা সংশোধনীর পক্ষে বলতে পারেন আর যদি সংশোধন করতে চান তাহলে তাদের লিখিতভাবে দেয়া আবশ্যক" [রিপোর্ট মজলিসে মুশাভিরাত, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ৪২ (ছাপা হয় নি)]

২৪।... হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) বলেন ঃ

"প্রতিনিধিবৃন্দের জন্যে ইহাও আবশ্যক যে, মজলিসে যে রঙ্গে কথা-বার্তা বলা হয়েছে এবং যে ফলা-ফল বের করা হয়েছে আর যে-সব প্রয়োজন জামাতের সামনে ধরা পড়েছে ফিরে গিয়ে এসব বিষয় জামাতের নিকট অবহিত করে" [রিপোর্ট মজলিসে মুশাভিরাত, ১৯৭৩ (ছাপা হয় নি) পৃঃ-২০]

২৫।... এমনি ভাবে দোয়ার আকারে বলেন ঃ

"ঐ দোয়া যা কিনা আমার মনে রয়েছে, তা আমি মুখেও নিয়ে আসছি। আপনাদের সকলকে, যারা মজলিসে শূরায় প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন তাঁদেরকে এসব কল্যাণ ও স্বভাবের উত্তরাধিকারী করো যা সৎ উদ্দেশ্যের সাথে খোদার পথে পরামর্শদানকারীদের জন্যে নির্ধারিত আছে" [রিপোর্ট মজলিসে মুশাভিরাত, ১৯৭৩ (ছাপা হয় নি)]।

২৬।... দোয়ার আকারে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) বলেনঃ

"আল্লাহ্তাআলা আপনাদের সাথী হোন। আপনাদেরকে মঙ্গল ও সুস্থাবস্থায় আনন্দের সাথে এবং স্বীয় হেফাযতের ব্যবস্থাপনার অধীনে ফিরিয়ে নিয়ে যান। আর আপনারা ফিরে গিয়ে জামাতে একটি নতুন জীবনের ঢেউ জাগানোর কারণে পরিণত হন এবং এর ফলে আমরা আল্লাহ্তাআলার নতুন নতুন আশিসকে সর্বদা আপনাদের ওপরে বর্ষিত হতে দেখতে পাই। খোদা করুন যেন এমনই হয়" [রিপোর্ট মজলিসে মুশাভিরাত, ১৯৮৪ (ছাপা হয় নি), পৃষ্ঠা ৩০৫]।

**মজলিসে শূরার জন্যে মৌলিক নির্দেশাবলী**

বর্তমান অবকাঠামোগত আকৃতিতে আহমদী জামাতে মজলিসে শূরা প্রথম প্রবর্তিত হয়েছিলো ১৯২২ ঈসাব্দে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) একে প্রতিষ্ঠা করেন। আর এর উদ্বোধনী ভাষণে যেসব মৌলিক নির্দেশাবলী প্রদান করেছিলেন উহা আজও মৌলিক গুরুত্ব বহন করে। এ ১৪ টি নির্দেশ হুযূর (রাঃ) পরের বছর অর্থাৎ ১৯২৩ ঈসাব্দেও পুনরায় বর্ণনা করেন ঃ

১।..."প্রত্যেক ব্যক্তি খোদার দিকে ধ্যান নিবদ্ধ করে ও দোয়া করে, আল্লাহ্! আমি তোমার জন্যে এসেছি, তুমি আমাকে পথ দেখাও। কোন ব্যাপারে আমার দৃষ্টি যেন ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে না যায়। কোন ভুল মতামতও যেন না দিই আর ইহাকে গ্রহণ করার জন্যে যেন চাপ প্রয়োগ না করি যাতে ধর্মের ক্ষতি সাধিত হয়। আর এমনও না হয় যে, কোন এমন অভিমত দেয় যা কিনা আসলে ত্রুটিপূর্ণ অথচ উহার তোষামুদে কথায় বা বাগ্মিতার কারণে তার সাথে ঐকমত্য হয়ে যাই। আমি তোমার নিকট দোয়া করি, এমনও যেন না হয় যে, আমার মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ সৃষ্টি হয়, নিজের সুনাম ও সম্মানের ধারণা সৃষ্টি হয় বা বাহাদূরীর ধারণা সৃষ্টি হয় বা বাহাদূরীর ধারণা এসে যায়। এমনও যেন না হয় যে, আমার অভিমত ত্রুটিযুক্ত ও ক্ষতিকারক। এমন যেন না হয় কারও ভুল মতামতের সমর্থন করি। আমার উদ্দেশ্য যেন সাধু হয়, আমার অভিমত সাধু হয় আর তোমার ইচ্ছার মাধ্যমে হয়। এ দোয়া প্রত্যেক বন্ধুর করে নেয়া উচিত। কেবল আজই নয় যখনই আমাদের জামাতে পরামর্শ করে সর্বদা এ দোয়া করা উচিত"।

২।... "প্রথম উপদেশ দোয়ার প্রসঙ্গে। কিন্তু এর সাথে সৎকর্ম যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কোন দোয়া গ্রহণীয়তার মর্যাদা লাভ করে না। যেমন, মানুষ দোয়া করে যেন তার ধর্মের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ হয়। কিন্তু কার্যতঃ একটি পয়সাও খরচ করার জন্যে প্রস্তুত না হয় তাহলে তখন তার কীভাবে সৌভাগ্য লাভ হবে?তাই দোয়ার সাথে সৎকর্মের আবশ্যক। এজন্যে আমি উপদেশ দিচ্ছি, আজও এবং কালও আর যখনই কোন পরামর্শ হয়, ব্যক্তিগত কথাকে মন থেকে দূরে নিক্ষেপ করে দিন। লোকেরা কোন কোন কথা মনে গেঁথে নিয়ে থাকে যে, এটা গ্রহণ করিয়েই ছাড়বো। কিন্তু পরামর্শের অর্থ এই নয় যে, এমন কথা বলো, বরং নিজের মস্তিষ্ককে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করে বলো এবং সঠিক কথা বলা উচিত। সাধারণভাবে লোকেরা সিদ্ধান্ত করে বসে যে, একথা গ্রহণ করাবোই। আবার এর জন্যে চাপ প্রয়োগ করে থাকে। কিন্তু আমাদের জামাতকে ইহা করা উচিত নয় বরং সঠিক কথা গ্রহণ করা আবশ্যক এবং গ্রহণ করানোও আবশ্যক"।

৩।... "যখন পরামর্শের জন্যে বসে তখন এ উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেয় যে, যে কাজের জন্যে পরামর্শ করা হচ্ছে এতে কারও অভিমত কল্যাণপ্রদ হতে পারে, ইহা নয় যে, আমার অভিমত গ্রহণ করা হোক"।

৪।... "এ কথা দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক যে, আজও আর আগামীতেও প্রত্যেক সময় যখন পরামর্শ নেয়া হয় তখন কারও খাতিরে পরামর্শ দেয়া উচিত নয়। পরে কতক লোক বলে থাকে, এতো আমার মতামত ছিলো না কিন্তু অমুক বন্ধু বল্লেন তাই দিয়ে দিলাম। টাকা-পয়সা আত্মসাৎ করা এত ভয়ানক নয় যতটা একথা ভয়ানক। কিন্তু একে এত তুচ্ছ মনে করা হয় যে, বড় বড় বিজ্ঞ লোক পর্যন্ত এ অপরাধ করে থাকে। হিন্দুস্থানের পার্লামেন্ট সম্বন্ধে কথিত আছে যে, একজন সদস্য বল্লেন, আমার মতামত ইহা ছিলো না। যেহেতু অমুক বন্ধু বল্লেন তাই আমি তার খাতিরে এ মতামত ব্যক্ত করেছি। আশ্চর্য, সে এ কথা বলতেও কোন দোষ মনে করে নি অথচ ইহা বড়ই অবিশ্বস্ততা। আমাদের লোকরা ইহা পরিহার করুন। আর কারও খাতিরে নয় বরং যে অভিমত সঠিক মনে করা হয়, তা দেয়"।

৫।... "অন্য কোন প্রজ্ঞার বশবর্তী হয়ে মত দেয়া উচিত নয় বরং যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে তার জন্যে কোন্ কথা উপকারী তা যেন দৃষ্টির সম্মুখে থাকে। উহার ব্যাখ্যার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যেমন, একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে অমুক কাজ চালু করা তো উপকারী মনে করে কিন্তু এটা মনে করে যে, যদি চালু করা হয় তাহলে অমুক এতে নিযুক্ত হবে তাই এর বিরোধিতা করা হয়। ইহা অবিশ্বস্ততার কারণেও করা হয় এবং কখনও ঐ ব্যক্তিকে উপযুক্ত মনে করা হয় না। কিন্তু এতদ্ব্যতিরেকে যে, তার বক্তৃতার যখন প্রশ্ন আসে তখন বিতর্ক করে বা এভাবে বলে যে, উহাকে চালু করাই উচিত নয়। কেননা অমুক ব্যতিরেকে আর কেউ নেই যাকে এ কাজে লাগানো যেতে পারে অথচ সে উপযুক্ত নয়? সে বলে, একাজই সঠিক নয়। যেহেতু ইহা অবিশ্বস্ততা তাই ইহা হওয়া উচিত নয় বা এভাবে যে, একটি মিশন নিযুক্ত করা দরকার। এতদুদ্দেশ্যে অমুককে নিযুক্ত করা উচিত। এতে তার উদ্দেশ্য তো এই যে, সে যেন না যায় কিন্তু বিতর্ক এ আরম্ভ করে দেয় যে, মিশন প্রতিষ্ঠা করাই ঠিক নয়। এমন হওয়া উচিত নয়। আসল ব্যাপারে সঠিক অভিমত দেয়া আবশ্যক"।

৬।... "যে কথা সঠিক উহা স্বীকার করা থেকে বিরত থাকা উচিত নয়, তা যে কেউই উপস্থাপন করুক না কেন। যেমন, একটি কথা এমন ব্যক্তি উপস্থাপন করে যার সাথে কোন মতভেদ হয় কিন্তু কথাটা সঠিক। যদি কেউ ইহাকে এজন্যে পরিত্যাগ করে যে, উপস্থাপনকারীর সাথে তার মতবিরোধ রয়েছে সেজন্যে অবিশ্বস্ততা করছে"।

৭।... "কোন মতামত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তড়িঘড়ি করা বাঞ্ছনীয় নয়। কতক লোক প্রথমে মতামত দেয় না কিন্তু কথা শুনেই তড়িঘড়ি করে মতামত দিয়ে দেয়। লোকদের কথা শুনা উচিত। উহা যাচাই করে অতঃপর মতামত দেয়া উচিত এবং এমন না হয় যে, অন্যান্যদের মতামতকে অস্বীকার করে।

একতো আমি ইহা বলেছিলাম যে, অন্যের জন্যে যেন মতামত না দেয়া হয়। আবার আর একটি কথা এই যে, অন্যের কথার ওপরে যেন মতামত প্রতিষ্ঠিত করা না হয়। যেমন, এক ব্যক্তি বলে যে, অমুক কাজে অনিষ্ট আছে। অন্য একজন অনিষ্ট সম্বন্ধে উপলব্ধি না করেই বলে, হ্যাঁ, অনিষ্ট আছে। তার স্বয়ং নিজ স্থানে সত্যাসত্যের পরীক্ষা করা উচিত"।

৮।... "কখনও মনে একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে না যে, আমাদের অভিমত সুদৃঢ় ও নির্দোষ। কতক লোক এতে হোঁচট খায়। বলে, আমাদের মতামত ভুল হতে পারে না। আর সত্য থেকে দূরে সরে যায়। কখনও দেখা গিয়েছে যে, শিশুরাও আশ্চর্য কথা বলে দিয়ে থাকে। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম স্ত্রীদের নিকট থেকে পরামর্শ চাইতেন। হুদায়বিয়ার সময়েই যখন লোকেরা ক্রুদ্ধ ছিলেন তখন হযরত রসূলে করীম (সঃ) হযরত উম্মি সালমা (রাঃ)-কে প্রশ্ন করেন, কী করা যায়? তিনি (রাঃ) বলেন, কারও সাথে কথা না বলে আপনি গিয়ে কুরবানী করুন। তিনি (সঃ) এমনই করলেন। পরে সকলেই কুরবানী করলেন। তাই নিজের কোন মতামতের ওপরে হঠকারিতা ও জিদ করা উচিত নয়। কেননা, বড়দের মতামতেও ভুল হয়ে যায়। আবার কখনও সাধারণ লোকের মতামত সঠিক ও উপকারী সাব্যস্ত হয়ে থাকে। মজলিসে জ্ঞানের প্রসারের প্রতি লক্ষ্য রেখে বসা আবশ্যক। অবশ্য ইহাও দোষণীয় যে, মানুষ অন্যের প্রত্যেক কথাই গ্রহণ করতে থাকে। সত্য ও জ্ঞানপূর্ণ কথাকে স্বীকার করো এবং মূর্খতা-পূর্ণ কথাকে গ্রহণ কোর না"।

৯।... "সর্বদা বাস্তবতাকে দৃষ্টির সম্মুখে রাখা উচিত। আবেগানুভূতির দাস হওয়া উচিত নয়। কতিপয় লোক অনুভূতিকে জাগ্রত করে দেয় এবং লোকের বাস্তবতার প্রতি দৃষ্টি দেয় না। আমিও একবার অনুভূতি কর্তৃক উপকৃত হয়েছিলাম। কিন্তু সাথে সাথে দলীল-প্রমাণও উপস্থাপন করা হয়েছিলো। অনুভূতিকে সমর্থন সাপেক্ষে উপস্থাপন করা ও উহা দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ, কিন্তু কেবল উহার প্রতি ঝুঁকে পড়া বা উহাকে জাগ্রত করে মতামত বদলিয়ে দেয়া অবিশ্বস্ততা। যদি কেউ ইহা অবহিত থাকে যে, তার দলীলগুলো দুর্বল তখন সে আবেগসমূহকে উদ্বেলিত করে তা হয় তখন অবিশ্বস্ততা আর কেউ যদি ইহা জানে যে, দলীলসমূহ ভুল কিন্তু আবেগসমূহের দিকে ঝুঁকে গিয়ে মতামত দিয়ে দেয় তাহলে তা-ও অবিশ্বস্ততা"।

১০।... "দু' প্রকারের কথা হয়ে থাকে। এক তো ঐ কথা যাতে পার্থিব স্বার্থ অধিক হয়ে থাকে এবং ধর্মীয় স্বার্থ কম। যেহেতু আমরা ধর্মীয় জামাত এজন্যে আমাদের এ কথার ওপরে মতামত দেয়া উচিত যাতে ধর্মীয় উপকার অধিক"।

১১।... "সর্বদা এ কথা দৃষ্টির সম্মুখে রাখা উচিত যে, আমাদের প্রস্তাবসমূহ কেবল ভুলই যেন না হয় বরং ইহাও দৃষ্টিতে রাখা যে, যার মোকাবেলায় আমরা দাঁড়িয়েছি তার প্রস্তাবসমূহ থেকে অগ্রগণ্য ও আরও প্রভাব সৃষ্টিকারী হয়। আর আমাদের কাজ এমন হওয়া আবশ্যক যে, শত্রুর কাজের চেয়ে শক্তিশালী হয়। যেমন, এমন জায়গায় যদি একটি বাড়ী নির্মাণ করে যেখানে পানির উৎস পাওয়া যায় না। উহা যদি অধিক মজবুত না-ও হয় তাহলেও ভাল কিন্তু যেখানে পানির উৎস জোরে প্রবাহিত হয় সেখানে যদি মজবুত না বানানো হয় তাহলে ভুল হবে। অতএব আমাদের মজলিসে শূরাতে এমন হওয়া উচিত নয় যে, এতে ভুল না হয় বরং ইহাও হয় যে, এমন উন্নত ও শক্তিশালী প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপিত হয় যা শত্রুর মোকাবেলা করতে পারে। আবার আরও একটি কথা এই যে, শত্রুর মোকাবেলায় আমাদের চেষ্টা ও প্রস্তাবসমূহ উন্নত ধরনের হয়। দ্বিতীয়তঃ এই যে, আমাদের বিগত দিনের প্রস্তাব থেকে নতুন প্রস্তাব যেন উন্নত স্তরের হয়। এ দু'টি কথা ভুলে যাওয়ার কারণে জাতির অধঃপতন সাধিত হয়। এ থেকে যদি একটিকে পরিত্যাগ করা হয় তাহলেও অধঃপতন আরম্ভ হয়ে যায়"।

১২।... "মতামত দেবার সময়ে এ দিকেও দেখা কর্তব্য, যে কথা সম্মুখে এসেছে উহা বাস্তবক্ষেত্রে কল্যাণজনক না ক্ষতিকারক। মোকাবেলায় এসে কোন সাধারণ কথা দ্বারাও বিতর্ক আরম্ভ হয়ে যায় যদিও এর আসল কথা ক্ষতিকারক বা উপকারী হওয়ার সাথে সম্পর্ক থাকে না। সুতরাং শাখা-প্রশাখা নিয়ে বিতর্ক আরম্ভ করা উচিত নয় বরং বাস্তবতাকে দেখা উচিত যে, ইহা উপকারী না ক্ষতিকারক"।

১৩।... "কোন বিশেষ কথা ব্যতিরেকে কেবল পুনরাবৃত্তির জন্যে দাঁড়াবে না। সকলের বলাটা জরুরী নয়, অবশ্য যদি নতুন প্রস্তাব থাকে তো আলাদা কথা"।

১৪।... "প্রত্যেকের নিজ নিজ সময় বাঁচানো উচিত এবং অন্যদের সময় যেন নষ্ট না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক" (রিপোর্ট মজলিসে মুশাভিরাত, ১৯২২ পৃষ্ঠা ৮-১৩)।

১৫।... হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) ১৯৪০ সনের মজলিসে মুশাভিরাতে উদ্বোধনী ভাষণে বলেন ঃ

**"আমাদের জন্যে ঐসব লোকই কল্যাণজনক যাদের মাঝে ধৈর্য ও তাকওয়া বা খোদা-ভীতি রয়েছে। তারা ভালভাবে যদি বক্তব্য পেশ না করতেও পারে তাহলেও। এজন্যে তুলনামূলকভাবে তাদের চেয়ে ভাল যাদের মধ্যে ধর্ম ও তাকওয়া নেই হোক না সে অনেক সুবক্তা হোক না তার ঘর সোনা ও রূপোর। আমাদের এমন লোকদের কোন প্রয়োজন নেই। এসব লোক আমাদের মজলিস থেকে যতই দূরে থাকে ততই আমাদের জন্যে মঙ্গল"।**

১৬। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) বলেন ঃ

"আসল মজলিসে শূরা উহা যা ইসলাম উপস্থাপন করেছে। যাতে তোমরা ভোটও চাও না, আর দল বানানোরও কোন অধিকার নেই। সাধারণ মানুষদের অধিকার এই যে, দৈনন্দিন জীবনে যাকে তারা ভাল দেখে যাকে দৈনন্দিন জীবনে তারা খোদা-ভীরুতার ওপরে প্রতিষ্ঠিত দেখে এথেকে কারও নাম বেছে নেয়। আবার পরে আমাদের ব্যবস্থাপনায় এমন নিয়ন্ত্রণ প্রণালী রয়েছে তা খুবই শক্তিশালী যে, এর নাম পার্লামেন্ট নয় মজলিসে শূরা। পরামর্শ দেয়া আবশ্যক অথচ ইহা আবশ্যক নয় যে, অধিকাংশ লোকের মতামতকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে" (মজলিসে মুশাভিরাত, ব্রাসেলস ৯-৯-১৯৯২ তারিখের ভাষণ, পৃষ্ঠা ৭)। চলবে

[মার্চ ১৬-২২, ২০০১ তারিখের আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল এর সৌজন্যে]।

অনুবাদ ঃ **মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

---

(অমৃতবাণী ঃ ৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

"আমি দৃঢ় ইয়াকীন ও দাবীর সঙ্গে বলছি যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপরে কামালতে নবুওয়ত (নবুওয়তের পরিপূর্ণতা) শেষ হয়ে গেছে। সেই ব্যক্তি ঝুটা এবং প্রতারক যে তাঁর (সঃ) খেলাপে বা বিরুদ্ধে এবং বাইরে কোন সিলসিলা কায়েম করে বা অন্য কোন ধারা স্থাপন করে। এবং তাঁর (সঃ) নবুওয়ত থেকে আলাদা হয়ে কোন সত্যতা উপস্থাপন করে এবং নবুওয়তের ঝরণা-প্রবাহকে পরিত্যাগ করে। আমি পরিষ্কারভাবে বলছি, সেই ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ব্যতীত, তাঁর (সঃ) পরে, অন্য কাউকে স্বতন্ত্র নবী বলে বিশ্বাস করে, এবং তাঁর খতমে নবুওয়তকে ভেঙ্গে ফেলে। এটাই হচ্ছে সেই কারণ যে জন্য, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পর এমন কোন নবী আর আসতে পারবে না যার উপরে নবুওয়তে মুহাম্মদীয়ার মোহর থাকবে না। আমাদের বিরুদ্ধবাদী মুসলমানেরা এই ভ্রান্তির মধ্যে পড়ে আছে যে, তারা খতমে নবুওয়ত ভেঙ্গে ফেলে আসমান থেকে এক ইসরাঈলী নবীকে আনার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছে। কিন্তু আমি বলছি যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পবিত্র-করণ শক্তি এবং তাঁর চিরন্তন নবুওয়তের এ এক সামান্য নিদর্শন যে, তেরশ' বছর পরেও তাঁর (সঃ) শিক্ষা-প্রশিক্ষণ বা 'তা'লীম-তরবিয়তের ফলশ্রুতিতে তাঁর উম্মতের মধ্য থেকেই মসীহে মাওউদ অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহ্-এর আগমন ঘটেছে তারই নবুওয়তের মোহর ধারণ করে। এই আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস যদি কুফরী হয়, তাহলে আমি সেই কুফরীকে প্রিয় মনে করি। কিন্তু ঐ সকল লোক যাদের জ্ঞান-বুদ্ধি তমসাচ্ছন্ন হয়ে গেছে, যাদেরকে নবুওয়তের নূর থেকে কোন অংশই দেওয়া হয় নি, তারা বিষয়টিকে অনুধাবন করতেই পারে না এবং একেই কুফরী আখ্যা দান করে থাকে। অথচ, এটাই সেই সত্য, যদ্বারা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পরিপূর্ণতা ও চিরজীবি হওয়া প্রমাণিত হয়" (আল্ হাকাম, ১০ই জুন, ১৯০৫ পৃঃ২)।

তাঁর (সঃ) বরকতময় নামগুলির মধ্যে রহস্য এই যে, মুহাম্মদ ও আহ্মদ যে দু'টি নাম, তার মধ্যে দু'টি চরম উৎকর্ষতা রয়েছে। 'মুহাম্মদ' নামের মধ্যে রয়েছে জালাল ও কিব্রিয়া অর্থাৎ মহিমা, গৌরব, প্রতাপ ও মহত্ব। এই নামের অর্থই হচ্ছে, অতীব উচ্চ স্তরের প্রশংসায় প্রশংসিত। এর মধ্যে এক প্রকার মাশুকানা রঙ বা প্রিয়জন হওয়ার রঙ রয়েছে। কেননা, প্রশংসা তো করা হয়, যে জন মাশুক তারই। অতএব, এর মধ্যে জালালী রঙ বা মহিমা, গৌরব ও প্রতাপের গুণ থাকা অপরিহার্য। কিন্তু,'আহ্মদ' নামের মধ্যে রয়েছে আশেকানা রঙ বা প্রেমিক বা প্রেমিকার গুণ। কেননা, আশেক-এর কাজ হচ্ছে প্রশংসা করা। যে আপন মাহবুব ও মাশুকের বন্ধু ও দয়িতের প্রশংসা থাকে। এজন্যই, মুহাম্মদ নাম যেমন আপন মর্যাদার খাতিরে মহিমা, গৌরব, প্রতাপ ও মহত্বের বা জালাল ও কিবরিয়ার প্রত্যাশী, তেমনি, 'আহমদ' নামও আপন আশেকানা মর্যাদার কারণে গরীবি ও নম্রতার আধারস্বরূপ। এর মধ্যে একটা রহস্য এটাই ছিল যে, তাঁর (সেঃ) জিন্দেগীকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এক হচ্ছে তাঁর (সঃ) মক্কার জীবন, যার মেয়াদ কাল ছিল তের বছর, এবং দ্বিতীয় জিন্দেগী হচ্ছে তাঁর মদীনার জীবন যার মেয়াদ কাল দশ বছর। মক্কী জিন্দেগীতে তাঁর (সঃ) আহ্মদ নামের গুণাবলীর তাজাল্লী প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সময়ে তিনি (সঃ) দিন রাত খোদাতাআলার সমীপে আকুলভাবে কান্নাকাটি করছেন, সাহায্য চেয়েছেন এবং সর্বক্ষণ প্রার্থনার মধ্যে থেকেছেন। যদি কোন ব্যক্তি তাঁর (সঃ) সেই জীবনের দিনগুলি সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত হয় তাহলে সে দেখতে পাবে যে, তিনি (সঃ) তাঁর মক্কী জীবনে যত আকুল প্রার্থনা ও কান্নাকাটির মধ্যে দিনাতিপাত করেছেন ততটা কখনোই কোন আশেক বা প্রেমিকা তার প্রিয়তম দয়িতের সন্ধানে করে নি, কেউ করতে পারবেও না। কিন্তু তাঁর (সঃ) এই আকুল চিত্তের রোনাজারি তাঁর নিজের জন্য ছিল না, বরং তা ছিল দুনিয়ার অবস্থা জানার পর তারই জন্য। আল্লাহ্র ইবাদতের নাম ও নিশানা তখন মুছে গিয়েছিল। তাঁর আত্মা ও প্রকৃতির মধ্যে স্থির আল্লাহ্তাআলার প্রতি ঈমানের কারণে যে আস্বাদ ও আনন্দ তিনি লাভ করেছিলেন, সেই আস্বাদ ও ভালবাসার সেই আনন্দ দ্বারা তিনি স্বভাবতই দুনিয়াবাসীকেও বিমোহিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুনিয়াবাসীর অবস্থা তিনি যখন দেখতেন, তখন তাদের অযোগ্যতা ও তাদের স্বভাবের অবস্থা তাঁকে দারুণ মুশ্কিলের মধ্যে ফেলতো, মুসীবতের সম্মুখীন করতো। তিনি দুনিয়ার এ অবস্থা দেখে কেঁদে কেঁদে হয়রান হয়ে যেতেন। তিনি এজন্য এতো বেশী কষ্ট পেতেন যে, তাঁর প্রাণ যাওয়ার উপক্রম হতো। এদিকেই ইংগিত করে আল্লাহ্তআলা বলেছেন ঃ

'সম্ভবতঃ, তুমি তোমার প্রাণকেই বিনাশ করে ফেলবে এজন্যে যে, তারা মু'মিন (বিশ্বাসী) হচ্ছে না' (২৬ঃ৪)।

এ ছিল তাঁর (সঃ) অতি ব্যাকুল প্রার্থনার জীবন, এবং তাঁর 'আহ্মদ' নামের প্রকাশ। কিন্তু যে সময় এক অতি মহান আযিমুশ্শান লক্ষ্যের প্রতি তাঁর চিত্ত নিমগ্ন থাকতো, যার প্রকাশ ঘটেছিল তাঁর মদীনার জিন্দেগীতে এবং এ তাঁর 'মুহাম্মদ' নামের তাজাল্লী প্রকাশিত হওয়ার সময়ে, তা জানা যায় এই আয়াত থেকেঃ'এবং তারা বিজয় প্রার্থনা করলো, ফলতঃ (সত্যের) প্রত্যেক স্বৈরাচারী শত্রু পরাভূত হলো' [মলফুযাত, ৫২, ৫ পৃঃ ১৭৮, ১৭৯]।(প্রফেসর শাহ মুস্তাফিজুর রহমান অনূদিত 'রসূলে আজম মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ)-এর জ্যোতির্ময় গৌরব' পুস্তক থেকে)

# আমি না আপনি?

হে আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধবাদীগণ! একটু দাঁড়াও, তোমাদের কাছে আমার কিছু বলার আছে, যা তোমাদের শ্রবণ করা প্রয়োজন। আমার কথাগুলি শোনামাত্র অবিবেচকের ন্যায় ক্ষিপ্ত হয়ে আমাকে প্রহার করতে তেড়ে এসো না। তোমাদের উগ্রতাকে প্রশমন করতঃ আমার কথাগুলিকে মনোসংযোগসহ শ্রবণ করার চেষ্টা কর। অহেতুক গালমন্দ দিয়ে আমাকে বিব্রত করার চেষ্টা করো না। আমার মসজিদে বোমা মেরে আমাকে মারার প্রয়াস নিও না। আমার সম্পর্কে বিশদ কিছু না জেনে মিথ্যা ফতোয়ার তুবড়ি ছেড়ে আমার বিরুদ্ধে ভন্ড তাপসদের লেলিয়ে দিয়ে উল্লাস করো না। আমাকে আমার কলেমা উচ্চারণ করা ও আযান দেয়ার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করো না, কারণ আমি তোমাদেরই এক ভাই, সত্য ও শান্তির এক বিরল সাধক, ইসলামের একনিষ্ঠ এক সেবক। আমি অন্তরের গভীরতা থেকে বিশ্বাস করি যে, ধর্ম-জগতে একমাত্র প্রজ্জ্বলিত সূর্য হচ্ছেন আরবে আগত আবুল কাসিম হযরত মুহাম্মদ (সঃ)। মর্যাদার দিক থেকে তদীয় সমকক্ষ পৃথিবীতে আর কেউ নেই এবং ভাবীতেও কেউ হবে না। আর ইহাও আমার সত্য আকীদা যে, আল্ কুরআনই হলো খোদার একমাত্র মুখ নিঃসৃত পবিত্র বাণী, যার মধ্যে বর্তমান ও ভবিষ্যতে আগত প্রতিটি মানুষের জন্যই চলার নির্দেশনা ও সমস্যার সমাধান বিদ্যমান। ইহা নির্জলা মিথ্যা, "আমি মুখে যা বলি অন্তরে তা বিশ্বাস করি না।" বরং আমি যা বলি এবং যা লিখি তা নিখাদভাবে বিশ্বাস করি। মূলতঃ বিশ্বাস হলো আত্মার স্বীকৃতি, সেখানে শব্দের কোন ধ্বনি নেই, এর সত্যাসত্য নিরূপণের অধিকার একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র, যিনি মৃত ও জীবিতের হিসাব গ্রহণকারী। সুতরাং আমার বিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপ করে আমাকে তিরস্কার করতে ও ধিক্কার দিতে তৎপর হয়ো না। আমাকে অমুসলমান ও অস্বীকারকারী বলে গালি দিয়ে স্বীয় আত্মার উপরে অত্যাচার করার চেষ্টা করো না। এহেন প্রতিটি কর্মই বিকৃত মস্তিষ্কের পরিচায়ক। বহুকাল ধরে বহুজনেই এমনসব কর্ম সাধন করে আকাশের এজলাসে নিকৃষ্টভাবে নিন্দনীয় হয়েছেন। আসলে তারা সত্যের পরিপন্থী কর্ম করতে ভীষণভাবে অভিলাষী ও তৎপর। মূলতঃ তারা ভ্রমে নিপতিত এবং মিথ্যার পূজারী আর জগতের মোহমায়ায় মুহ্যমান। তারা স্বর্গ সিদ্ধান্ত বাঞ্চাল করার মুখোশধারী ষড়যন্ত্রকারী। অনুরূপ আত্মা অবশ্যই অসাধু এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিভেদ সৃষ্টিকারী। তারা সমাজের সাধারণজনের আত্মার মুক্তির পথ সন্ধানের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টিকারী। এম্নিতর আচরণের কারণেই খোদা তাদের প্রতি অসম্ভবভাবে বিরাগভাজন। এই প্রেক্ষিতেই পবিত্র কুরআন বলে, - **ইয়্যা হাসরাতান আলাল 'ইবাদি মা'ইয়া তিহিম্মীর রসূলীন ইল্লা কানূ বিহী ইয়াস্‌তাহ্‌যিউন।"** (অর্থ) হায়! বড়ই পরিতাপ, বান্দাগণের জন্য। তাহাদের নিকট এমন কোন রসূল আসে নাই, যাহাকে নিয়া তাহারা হাসি-ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করিয়াছে (৩৬ঃ৩১)। ফলেই সময় সময় পৃথিবী পৃষ্ঠে সংঘঠিত হয় শক্তিধর খোদার রুঢ় শাসনের ভয়াল কর্মের তান্ডব লিলা, যার এমনটি হচ্ছে আজকের দিনের ভূমিকম্পের ভয়ঙ্করতা। আর অনুরূপ সব তান্ডব লীলা সাধিত হওয়ার পিছনে খোদাতাআলার পক্ষের যুক্তি হলো - **ওয়ামা কানা রব্বুকা মুহালিকাল কুরা হাত্তা ইয়াব্‌আসা ফী উম্মিহা রসূলাইয়াতলু আলায়হিম আইয়াতিনা ওয়ামা কুন্না মুহলিকিল কুরা ইল্লা ওয়া আহলুহা যলিমূন** (অর্থাৎ) এবং তোমার প্রভু জনপদসমূহকে কখনও ধ্বংস করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি ঐগুলির কেন্দ্রস্থলে এমন কোন রসূল প্রেরণ করেন যে, তাহাদের নিকট আমাদের আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনায় এবং আমরা জনপদসমূহকে কখনও ধ্বংস করি না যতক্ষণ পর্যন্ত না উহার অধিবাসীগণ যালেম হইয়া যায় (২৮ঃ৬০)।

সুতরাং হে চিন্তাশীলব্যক্তিগণ তদ্বিষয়ে আপনার আত্মাকে সচেতন করুন। প্রিয় বন্ধুবর! ইসলাম জগতে আর কখনোও উম্মতি নবীর আগমন ঘটবে না ইহা যেমন আপনার অন্তরে লালিত চিন্তাগুলির মধ্যে একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস। তেমনিভাবে বনী ইস্রাঈলী নবী হযরত ঈসা মসীহ (আঃ) অদ্যবধি সশরীরে আকাশে জীবিত আছেন ইহাও আপনার বিশ্বাসসমূহের এক ভ্রান্ত বিশ্বাস। কারণ একজন সাধারণ মানুষ কখনও দু' হাজার বছর অবধি আকাশে (শূন্যে) জীবিত থাকতে পারে এমন উদ্ভট অলীক বিশ্বাস কোন সুস্থ মস্তিষ্কের বিশ্বাস বলে বিবেচিত হতে পারে না। ইহা কুরআন এবং হাদীসমূলে কখনও ভ্রান্তহীন বলে প্রমাণ করতে সক্ষম হবেন না। কাজেই বাস্তবতার সাথে সম্পর্কহীন আপনার ইত্যাকার ভ্রান্ত বিশ্বাসের অসারতা নিরসন নিমিত্তেই আজ আমি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানের যুক্তি নিয়ে আপনার দারস্থ হয়েছি। আমি অতীব বিনয় এবং কাতরতার সাথে আপনার নিকট অনুযোগ করছি যে, আপনি আমাকে দৃষ্টিহীন অজ্ঞের ন্যায় তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সাথে বিতাড়িত করার চেষ্টা করবেন না। নির্মল চিত্ত নিরহংকার মন এবং শান্ত বিবেক বিনিয়োগে আমাকে বুঝার চেষ্টা করুন। আমার বক্তব্যকে বিবেচনা করতে যত্নবান হউন। ঈমানের মানদন্ডে আমাকে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করুন। আমি আমার খোদাকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমার কাছে সত্যই স্বর্গ হতে এক প্রতিনিধি আগমনের শুভ সংবাদ রয়েছে, যাঁকে আপনার গ্রহণ করা ও তাঁর কর্মে সহায়তা দান করা এক বিশেষ দায়িত্ব। তবে হয়ত আপনার প্রভাব-প্রতিপত্তি বিনষ্ট হওয়ার ভয়ে তা আপনি প্রত্যাখ্যানও করতে পারেন। সে অধিকার আপনার আছে। কিন্তু কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা মতে আপনার স্কন্ধে সে দায়িত্ব অর্পিত আছে। মনে রাখবেন, মানব জীবনের চরম সার্থকতা এখানেই যে, একজন মানুষ তার জীবদ্দশায় স্বর্গ থেকে আগত মহাজনের সংবাদ অনুসন্ধান করবে ও তাঁর হস্তে দীক্ষা গ্রহণ করতঃ প্রভূত কল্যাণের ভাগীদার হবে। পক্ষান্তরে এই গুরুভার পালন ব্যর্থ হওয়ার অপর নামই হচ্ছে আত্মার অপমৃত্যু, যার পরিণাম ফল হচ্ছে ওপাড়ের তিরস্কৃত অবিনশ্বর জীবন। অতএব আমি যুগের মাহদী (আঃ)-এর আগমনের যে শুভ সংবাদ দিয়ে গেলাম তাঁর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা ও তাঁকে নিন্দার সাথে উপেক্ষা করা আপনার জন্য মোটেই কোন শুভ কর্ম নয়। কারণ ইহা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, এতে আপনার আত্মা স্বর্গের সকল প্রকার কল্যাণ ও আশীষ থেকে বঞ্চিত হবে। কেবল শুধু আপনিই নন বরং আপনার সস্নেহে লালিত স্ত্রী-পুত্র-পরিজন সকলেই আপনার এই অপরিণামদর্শী কর্মের জন্য অনুতাপের ভাগীদার হবে।

তবে ইহাও জোর সত্য যে, আপনি আমাকে যতভাবেই অপমান ও অপবাদ দিয়ে উৎপীড়ন

ও উৎখাত করার চেষ্টা করুন না কেন আমি কিন্তু কিছুতেই কিছু মনে করব না। কারণ আমি সেভাবেই আদিষ্ট হয়ে আছি। কাজেই আমি এসব অপমানের লজ্জায় কখন আপনার সান্নিধ্য থেকে দূরে সরে যাব না এবং থেমেও থাকব না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাকে খোদার প্রতিনিধি মাহদী (আঃ)-এর দাবীর সত্যতা এবং খৃষ্টানদের নবী হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর ঘটনাকে প্রমাণ করতে সক্ষম না হবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনার পাশে পাশে থাকব এবং আপনাকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করে চলতে থাকব। কারণ অনুরূপ কর্ম সাধনের জন্যই সেদিন আমাদের প্রিয় রসূল (সঃ)-এর পবিত্র দন্ত শহীদ হয়েছিল। তাঁকে তাঁর প্রিয় মাতৃভূমি মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করতে হয়েছিল। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে হয়েছিল এবং মূসা (আঃ)-কে সাগর পাড়ি দিতে ও ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশে বিদ্ধ হতে হয়েছিল। আপনাদের মত এমন অবুঝ জনেরাই সেদিন সেখানে তাঁদের সাথে অনুরূপ আচরণ দ্বারা যাতনা দিয়েছিল যেমনটি আজ আপনারাও আমার সাথে করছেন। পরিণামে জয় হয়েছিল তাঁদেরই যাঁরা ছিলেন স্বর্গ সত্যের ধারক ও বাহক। সুতরাং বর্তমানেও আমাকে এবং আমার জামাতের প্রতিটি সদস্যকে অতীতে আগত পুণ্যাত্মাগণের নীতি ও আদর্শকে অনুসরণ করে অনুরূপ কর্ম সাধন করে যেতে হবে। কারণ এ কর্মটি বরাবরই তাদের স্কন্ধে বর্তায় যারা চক্ষুষ্মান এবং যুগের প্রত্যাদিষ্ট জনের সত্য প্রতিষ্ঠা কল্পে স্বীয় জীবন উৎসর্গকারী। তাই ইহা নিশ্চিত সত্য যে, বিজয় আমারই হবে।

হে আমাদের বিরুদ্ধবাদী ব্যক্তিগণ! ঈমানের মনোনয়নের ক্ষেত্রে জেদ ধরা কিংবা ঈর্ষা পোষণ করা মোটেই কোন সাধুজনের কাজ নয়। বরং তা অসাধু জনের কাজ। অনুরূপ কর্ম কেবল তদ্রূপ স্বভাববিশিষ্ট অসাধু আত্মার বেলায়ই প্রযোজ্য। কোন মু'মিন ব্যক্তি অনুরূপ কর্মে বিশ্বাসী নয় তাতে ইসলামের আদর্শের কোন স্বীকৃতি নেই। বরঞ্চ যারা খোদার নৈকট্য লাভের প্রত্যাশায় আপন গর্দান উৎসর্গ করে দিতে প্রস্তুত তাদের বেলায় এ কথাই সঠিক যে, স্বর্গ থেকে আগত কোন পুণ্যাত্মার আগমন-বার্তা শ্রবণ মাত্রই তাঁর অনুসন্ধানে তারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। এখানে লাঠি-বটি কিংবা দা-কীরীচ নিয়ে হানাহানি করা ও কাফির ফতোয়ার তুবড়ি ছাড়ার কোন অবকাশ নেই। প্রকারান্তরে এখানে একথাই যুক্তিযুক্তভাবে সিদ্ধ যে, **"লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়াদীন"** (ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সকলেই আপনভাবে স্বাধীনতার অধিকারী (১০৯ঃ৭)। এ ব্যাপারে বল প্রয়োগে বাধা দেয়ার রেওয়াজ নেই" অর্থাৎ লা-ইকরাহা ফিদ্দীন" (২ঃ২৫৭)। তাই কুরআনের এই স্বাধীনতা ঘোষণামূলে আমি আমার বৈরী ভাইদের উদ্দেশ্যে এ কথাই বলতে চাচ্ছি যে, আমার ধর্মবিশ্বাসকে স্বাধীনভাবে পালন ও লালন করার অধিকার দিন, আমার অন্তরের আকীদাকে অকাতরে উচ্চকণ্ঠে সমাজ মঞ্চে উচ্চারণ করার সুযোগ দিন। হ্যাঁ, যদি তা-ই হয়, তাতে এবার আমি আমার ধর্মীয় আকীদার সাকল্য বিষয়গুলিকে অকপটে আপনাদের জ্ঞাতার্থে উপস্থাপন করছি, আর তা হলো এই যে, আমি নিতান্তই একজন খাঁটি ধর্মপ্রাণ মুসলমান। বল প্রয়োগ দ্বারা আমাকে অমুসলমান আখ্যা দেয়ার চেষ্টা করবেন না। কেননা, আমি একীন করি যে, পবিত্র কুরআন জীবন্ত খোদার জ্বলন্ত বাণী। ইহার প্রতিটি শব্দ এবং প্রতিটি নির্দেশ কিয়ামত কালতক অপরিবর্তনীয় অবস্থায় থাকবে। ইহাও আমার বিশ্বাস যে, ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মরুর দুলাল হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) কেবল একজন রসূলই নন, বরং তিনি খাতামান্নাবীঈন অর্থাৎ নবীগণের মোহরও বটেন। সাথে আমি এ-ও বিশ্বাস করি যে, কাদিয়ানে আগত ইসলামের উম্মতি নবী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ, ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর দাবী হাদীস ও কুরআনের মানদন্ডে নিখুঁতরূপে সত্য। আকাশ তার বিশেষ কান্ডের দ্বারা, জমিন তার বেনজীর ঘটনার দ্বারা, পাহাড় তার তান্ডবলীলার দ্বারা, দরিয়া তার অভূতপূর্ব কর্মের দ্বারা অহর্নিশি সেই স্বর্গীয় সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে। অথচ এতসব দেখা এবং বুঝার পরও আপনারা তাঁকে গ্রহণ তো করছেনই না উপরন্তু আপনাদের হিংসার দংশনে ও স্বার্থ সফল না হওয়ার শংকায় ঐ সত্যের অন্তরায় হয়ে সমাজে ফিৎনার সৃষ্টি করছেন। কিন্তু পবিত্র কুরআন বলে -**ওয়াল ফিত্নাতু আকবারু মিনাল কাতলে** অর্থাৎ ফিৎনা হত্যা অপেক্ষাও বৃহত্তর (২ঃ২১৮)।

সুতরাং তৎপ্রতি দৃষ্টি দিন এবং আমার দাবীকে নিরহংকার চিত্ত দ্বারা বিবেচনা করার চেষ্টা করুন। কারণ আপনাদের ষড়যন্ত্র ও মিথ্যা অপবাদের যন্ত্রণায় জামাতে আহমদীয়ার খোদায়ী প্রোগ্রাম আদৌ স্তিমিত হবে না। এ জামাতের ভিত্তি স্বয়ং খোদার হস্তে প্রোথিত এক পবিত্র প্রস্তর। যারা এর উন্নয়ন পরিপন্থী কিছু সাধন করার অভিলাষে স্বীয় বাহুবলে নড়া চড়া করার চেষ্টা করবেন খোদা তাদেরকে ধ্বংস করতঃ সুস্থির হবেন। বস্তুতপক্ষে মসীহ (আঃ)-এর সাথে তাঁর অঙ্গীকার অনুরূপই বটে। তিনি ওয়াদা করেছেন, "হে আমার প্রিয় মসীহ্! পরিশেষে তোমার জীবনের দুর্নাম হইবে ও তোমার অগ্রযাত্রার বিপত্তির সৃষ্টি হইবে এমন কোন কিছুরই চিহ্ন আমি রাখিব না। বরং প্রয়োজনে পৃথিবীতে ভয়ঙ্কর সব আযাবসমূহের দ্বারা তোমার কর্ম মহিমাকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিব, পরিণামে বিপত্তি কারীগণই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।"

তাই বলছি, হে বন্ধুগণ! হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-কে চিনুন, জানুন এবং তাঁকে গ্রহণ করার চেষ্টা করুন। কারণ তিনি অবশ্যই স্বর্গের আদেশপ্রাপ্ত সত্য মসীহ্। আর তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জামাতে আহমদীয়ার কর্মকান্ড আকাশের পরিকল্পনার বাস্তবরূপ। সুতরাং স্বর্গীয় এ সিদ্ধান্তকে মানতে গিয়ে আর ভেবে দেখার প্রয়োজন নেই, সময়ও নেই। কারণ যুগের লক্ষণই এ সত্যতার প্রকৃষ্ট সাক্ষী, বরঞ্চ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্বতা হেতু ইতোমধ্যেই পৃথিবীতে শুরু হয়েছে বিবিধ বিপর্যয়ের তুলকালাম কান্ড। তাই মানুষের বুদ্ধি আজ অচল হয়ে পড়েছে, শান্তি ও সুন্দর পৃথিবীকে পরিত্যাগ করেছে, এখানে প্রণিধান করা প্রয়োজন যে, রহমান খোদা বলেন, "নিশ্চয় জ্ঞানীরাই তাঁর বান্দাদের মধ্যে আল্লাহ্কে বেশি ভয় পায়।" সুতরাং সম্পদ দাপটে প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার লালসা পরিত্যাগ করতঃ যুগ-মাহ্দীর সাথী হয়ে স্বর্গীয় জ্ঞানে গুণী হউন, কারণ ইহাই অধিকতর শ্রেয়। প্রয়োজনে আপনার মনের দূরভিসন্ধিকে দূর করতে চিত্ত ক্রন্দনসহ আল্লাহ্র দরবারে হাত তুলে পরখ করে নিন। কে সত্য পথের পথিক আমি না আপনি?

**- মোহাম্মদ ফজলে-ই-ইলাহী**

ছোটদের পাতা

# মিনহাজুত্‌তালেবীন

(সত্য সাধকদের রাজপথ)

হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

(একটি ওয়াকফে নও পাঠ্য-পুস্তক)

(শেষ কিস্তি)

এখন আমি আসল বিষয়ের দিকে ফিরে আসছি। আমি যেসব নীতির কথা বলেছি, যদি এগুলোর ওপরে আমল করা সত্ত্বেও পুণ্যকমে উৎকর্ষ লাভ না হয় ও অনিষ্ট থেকে মানুষ রক্ষা না পায় তাহলে মনে করা উচিত যে, তার আধ্যাত্মিক রোগ নেই বরং দৈহিক রোগ রয়েছে। তার স্নায়ুতে দুর্বলতা রয়েছে। এমনই অবস্থায় তাঁর ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া অবশ্য কর্তব্য আর যদি এ সুযোগ না থাকে তাহলে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা দরকার ঃ ১। ব্যায়াম করে ২। মানসিক পরিশ্রম বন্ধ করে। ৩। উত্তম খাবার গ্রহণ করে ও ৪। নিজের প্রাণে সন্তুষ্টি পোষণ করার চেষ্টা করে।

ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, কখনও কখনও রোগ-ব্যাধি আত্মিক কুসংস্কার থেকেও সৃষ্টি হয়। যেভাবে দুশ্চিন্তা থেকে দৈহিক রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি হয়ে যায়। তেমনিভাবে আত্মিক দুশ্চিন্তা থেকে আধ্যাত্মিক রোগ-ব্যাধিতেও পেয়ে বসে।। আমার নিজেরই অভিজ্ঞতা এই, যখন আমি হেকিমী চিকিৎসা শাস্ত্র পাঠ করছিলাম তখন যে রোগ সম্বন্ধে পড়তাম উহার সম্বন্ধে মনে হতো যে, আমার মধ্যেও ইহা রয়েছে। এ ধারণা করতাম যে, সম্ভবতঃ আমারও এ একই অবস্থা হবে। কিন্তু এক ডাক্তারের ছাত্ররা আমাকে বলেন, তাদের শিক্ষক ক্লাসে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, ছাত্রদের এ ধরনের কল্পনা সৃষ্টি হতো। তাদের এতে জড়িয়ে পড়া ঠিক নয়। এজন্যে আমিও আপনাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি যে, এমন যেন না হয়। আধ্যাত্মিক ব্যাধিসমূহের প্রতি দৃষ্টি রেখে ইহা বুঝতে থাকো যে, ইহা আমাদের মধ্যেও রয়েছে এভাবে নিজেদেরকে অযথা রোগাক্রান্ত করে ফেল না। শুনেছি একজন শিক্ষক ছিলেন। সে ছাত্রদের ওপরে নির্যাতন চালাতো। একদিন ছাত্ররা মনে করলো কোন-ভাবে ছুটি নিয়ে নেয়া উচিত। একটি ছাত্র বললো, যদি আমাকে সমর্থন করো তাহলে আমি ছুটি নিয়ে দেবো। আমি গিয়ে বলবো, স্যার! আপনার আজ কী হয়েছে? আপনার মুখ পাংশু বর্ণের মনে হচ্ছে! পরে তুমি আসবে আর আমার কথায় সায় দেবে। ছাত্ররা এ প্রস্তাব গ্রহণ করলো। এর পর ঐ ছেলেটি গিয়ে বল্লো, স্যার! ভাল আছেন তো? স্যার বল্লেন, কি বক বক করছিস্। যা নিজের কাজ করগে। সে বল্লো, আপনার চেহারা পাংশু বর্ণের মনে হচ্ছে কেন? এর পর শিক্ষক তাকে গালি দিলেন। আর দ্বিতীয় একজন এগিয়ে আসলো সে এসেও এ রকমই বল্লো। তাকেও গালি দিলেন। কিন্তু এবারে কিছুটা কম। পরিশেষে ছাত্ররা পর্যায়ক্রমে আসতে থাকলো এবং এ-ভাবেই বলতে থাকলো। ষষ্ঠ সপ্তম ছেলে পর্যন্ত শিক্ষক এতটা মেনে নিলেন শরীর একটু খারাপ মনে হচ্ছে। তোমরাতো এমনিতেই পেছনে পড়ে গেছো। যখন পঞ্চদশ/ষষ্ঠদশ ছাত্রটিও বল্লো। তখন শিক্ষক বলতে লাগলেন, কিছু জ্বর জ্বর তো মনে হচ্ছে। আচ্ছা শুয়ে থাকি। এ মনে করতে করতে তার জ্বর উঠে গেলো এবং ছাত্রদের ছুটি দিয়ে বাড়ী চলে গেলেন। ছাত্ররা বাড়ী গিয়ে তাদের মাকে বল্লো, শিক্ষক অসুস্থ হয়ে গেছেন তাকে দেখতে যাওয়া দরকার। যখন মহিলারা তার ঘরে যেতে থাকলেন আর রোগের কথা বলতে থাকলেন তখন তিনি মনে করলেন, আমার তো খুব কঠিন রোগ হয়েছে। পরিশেষে এ রোগেই তিনি মারা গেলেন।

এতো একটি কাহিনী। কিন্তু ইউরোপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে, যখন থেকে পেটেন্ট ঔষধসমূহ আবিষ্কৃত হয়েছে রোগ-ব্যাধি বেড়ে গিয়েছে। এসব ঔষধের বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপন দাতারা এত বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে থাকে যে, সকল প্রকার রোগই লিখে দেয়। এ ঔষধ সর্বপ্রকার রোগের মহৌষধ। পাঠকরা নিজেকে কোন না কোন রোগে আক্রান্ত মনে করে নেয় পরে তাদের কুধারণা বাড়তে থাকে এবং তাদেরকে প্রকৃতই রোগী বানিয়ে তবে ছাড়ে। সুতরাং কু-ধারণার মধ্যে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়।

দ্বিতীয় কথা ইহা বুঝে নেয়া জাতীয় পর্যায়েও আবশ্যক যেন অশ্লীলতার প্রচার না করা হয়। কতিপয় লোকের অভ্যাস হয়ে যায় যে, তারা অযথা লোকদের বদনাম করা আরম্ভ করে দেয়। এখানকার সবলোক বদমায়েশ ও অন্যদের অধিকার খর্ব করে। প্রথম প্রথম কিছু লোকতো তার বিরুদ্ধে কথা বলতেও থাকে কিন্তু সে-ও এভাবে বলে যেতে থাকে যে, যদি এমন লোক থেকে থাকে তাহলে তাদের ঘরে রয়েছে। আমাদের তাতে কি আসে যায়। আবার এ থেকে সম্মুখে আগায় ও এ কথা বলে, এমন সব লোক আছে তো ঠিকই কিন্তু আমরা কী করি? পরে ধীরে ধীরে এমন কি নির্ধারিত কাল পর্যন্ত পৌঁছে যায়, সে-ও বলতে থাকে, সব লোক অসদাচরণকারী ও বদমায়েশ হয়ে গেছে। এমন লোকদের কথার প্রতি কান দেয়া উচিত নয়। নচেৎ মানুষ স্বয়ংই ঐ মন্দ আচরণে লিপ্ত হয়ে পড়বে। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে-ব্যক্তি কারও ওপরে অভিযোগ উত্থাপন করে, সে স্বয়ং এমনই হয়ে যায়। এভাবে জাতিগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। এজন্যে যে ব্যক্তি অশ্লীলতার প্রচার করে তার মোকাবেলা করা উচিত। আর তার নিকট দাবী করা দরকার, যে খারাপ তার নাম নাও। চিহ্নিত করো সাধারণভাবে সকলকে জড়াও কেন যে, সবলোক এমন হয়ে গেছে। যে খারাপ হয়ে গেছে তার কথা বলো আর যে মন্দ কাজে সে লিপ্ত হয়ে গেছে উহাও বলো। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে জাতি সম্বন্ধে বলা হয় যে, তা নষ্ট হয়ে গেছে, ঐ ব্যক্তিই তাদেরকে ধ্বংস করে দেবে। অর্থাৎ লোকদের বলা যে, আমাদের জাতি বিনষ্ট হয়ে গেছে এ ধারণা জাতিকে এমনই বানিয়ে দেবে। তাই সর্বদা এমন জাতীয় শত্রুর মোকাবেলা করা উচিত যে, অশ্লীলতা প্রচার করে ও জাতিকে মন্দ আখ্যায়িত করে। কিন্তু এর সাথে সাথে আমি ইহাও বলছি, যে জাতি নির্ভয় হয়ে যায় সে জাতিও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এজন্যে প্রকৃত চিকিৎসা এই যে, এমন প্রত্যেকটি বিষয়ে, যা কি না কারও মন্দ প্রসঙ্গে হয়ে থাকে, উহাকে আদেশ দেবার অধিকারী ব্যক্তির নিকট পৌঁছানো উচিত যেন তিনি উহা পরখ করেন। ঐ দুর্বলতা যদি প্রকৃতই থাকে তাহলে উহার সংশোধনের চেষ্টা করে।

এ বক্তৃতা সম্বন্ধে আমার অনুমান ছিলো যে, এক দিনে শেষ হয়ে যাবে কিন্তু যখন আমি এর নোট লিখতে থাকি তখন দু' দিনে শেষ হয়ে যাওয়ার ধারণা করেছিলাম। কিন্তু এখনও নীতিগত ৪০ টি ফর্মূলা সম্বন্ধে বলা বাকী রয়ে

গেছে। আল্লাহ্‌তাআলা সৌভাগ্য দিলে পুস্তকে লিখে দেয়া হবে অথবা অন্য কোন সময়ে বলে দেয়া হবে। ৪০ টি ফর্মূলা এখন এমন অবশিষ্ট রয়ে গেছে যদ্বারা জানা যেতে পারে যে, মানুষ কীভাবে পুণ্যবান হতে পারে।

এখন আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের কথার ওপরে এ বক্তৃতা শেষ করবো। উহা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের এমন কথা যাতে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং বলে গেছেন, যদি আমরা পুণ্যবান না হই তাহলে আমাদের জামাত সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারে না। কেননা, এ অবস্থায় আমাদের জামাত খোদার অনুগ্রহের উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। এ জন্যে চেষ্টা করা দরকার যে, আমরা এসব নৈতিক গুলাবলী সৃষ্টি করি যা কিনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাদের জন্যে আবশ্যিক করে দিয়েছেন। আমি আশা করি এসব বন্ধু যারা আমার এ বছরের বক্তৃতার পরে যে নোট নিয়েছেন আর যারা বক্তব্য শুনেছেন তারা ব্যবহারিক জীবনে এসব পদ্ধতিকে অবলম্বন করবেন যেন আমরা পৃথিবীকে দেখতে পারি বাহ্যিক কর্মসমূহের ব্যাপারেও আমাদের জামাতের সমান কেউ নেই। সত্য কথা এই যে, যদি আমাদের জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তি ওলী আল্লাহ্‌দের অন্তর্ভুক্ত না হয় তাহলে বিশ্বকে মুক্তি দেয়া যেতে পারে না আর আমরা বিশ্বে কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারবো না। মনে রেখো! আমাদের মোকাবেলা দুনিয়ার বর্তমান অনিষ্টের সাথেই নয় বরং আমাদের মন্দ ধ্যান-ধারণার মোকাবেলাও করতে হবে। আর আমাদের মন্দ ধ্যান-ধারণার ধারার মোকাবেলা করতে হবে যা কিনা সব দিকে তরঙ্গায়িত হবে। অতএব আমাদের পদ-মর্যাদা খুবই স্পর্শকাতর। আমি বন্ধুগণের নিকট বিনয়ের সাথে এ আশা পোষণ করি যে, বন্ধুগণ এমনই রূপান্তরিত হওয়ার চেষ্টা করেন যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম আমাদেরকে বানাতে চান। এখন আমি হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর দোয়ার ওপরে বক্তব্য শেষ করছি এবং শেষে নিজেকেও এ দোয়ার মধ্যে শামেল করছি ঃ

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ

"আমি কী করি আর কোথা থেকে এমন ভাষা নিয়ে আমি যা এ মন্ডলীর (অর্থাৎ জামাতে আহমদীয়ার) অন্তরে প্রোথিত করে দিই। হে আমার খোদা! আমাকে এমন ভাষা দান করো এবং এমন বক্তৃতা ইলহামের মাধ্যমে শিখাও যা তাদের অন্তরে স্বীয় জ্যোতি বর্ষণ করে আর স্বীয় বিষ প্রতিশেধক বৈশিষ্ট্য দ্বারা তাদের অভ্যন্তরীণ বিষ দূরীভূত করে দেয়। আমার প্রাণ এ উৎসাহে উচ্ছ্বসিত হচ্ছে, কখন ঐ দিন আসে যেদিন আমার জামাতে এত অধিক সংখ্যক লোক দেখি যারা আসলেই মিথ্যা পরিহার করেছে ও একটি প্রকৃত অঙ্গীকার নিজ খোদার সাথে করেছে যে, তারা প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করেছে আর অহংকার থেকে যা কিনা সমস্ত অনিষ্টের মূল একেবারেই দূরে চলে যাবে। এবং স্বীয় প্রভু প্রতিপালককে ভয় করতে থাকবে"।

"আমি দোয়া করছি এবং যখন পর্যন্ত আমার জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস চলে, করতে থাকবো আর দোয়া এই-ই যে, খোদাতাআলা আমার এ জামাতের লোকদের প্রাণকে পবিত্র করে দেন এবং স্বীয় কৃপায় হাতকে লম্বা করে তাদের অন্তর তাঁর দিকে ফিরিয়ে দেন ও সর্ব-প্রকার অনিষ্ট ও ঈর্ষা তাদের মন থেকে উপড়িয়ে ফেলেন এবং পরস্পর ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন। আর আমি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি এ দোয়া কবুল হবে এবং খোদা আমার দোয়াগুলোকে বিনষ্ট করবেন না।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এ দোয়া কবুল হবে এবং খোদাতাআলা ওগুলোকে বিনষ্ট করবেন না। কিন্তু তোমরা চিন্তা করে দেখো যে, তোমরা উদ্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গে পরিণত হবে, না পরবর্তীতে আগমনকারীরা? যদি পরে আগমনকারীদের পক্ষে এ দোয়া কবুল হয় তাহলে পরে আমাদের লাভ কী? এজন্যে আমি বলি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়াকে দৃষ্টিপটে রেখে চেষ্টা চালাও যে, আমরাই যেন সেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তিতে পরিণত হই আর এ দৃশ্যাবলী দেখে আমাদের হৃদয়ে শীতলতা পৌঁছে যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) অংকন করেছেন।

এর পরে আমি দোয়া করে জলসা সমাপ্ত করছি এবং যারা যেতে চান তাদের যাবার অনুমতি দিচ্ছি। বই এর লাইব্রেরীর মালিকরা বলছেন, আমি যেন তাদের প্রকাশিত পুস্তকাদি নিয়ে যাবার জন্যে সুপারিশ করি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পুস্তকাদি যেন বন্ধুরা কিনে নিয়ে যান। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পুস্তকাদি প্রচার করা আপনাদের অবশ্য কর্তব্য স্বয়ং কিনে নিন ও পাঠ করুন এবং ওগুলোকে বিশ্বে ছড়িয়ে দিন অর্থাৎ অন্যদের নিকট পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করুন।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ঃ আল্‌হাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী
অনুবাদ - মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

## আম্মু তুমি লক্ষ্মী!

পৃথিবীতে যত ধরনের মানুষ আছে সবচে' দুর্বল আমি আম্মুর প্রতি। আম্মু কেন এত প্রিয় তা আমি আমার মনের কথায় কবিতার মধ্যে প্রকাশ করছি। আসলে কোন দিন প্রিয় আম্মুর গুণ গান লিখে শেষ করা যায় না। এক কথায় বলতে গেলে পৃথিবীতে যত ভালো কাজের রূপকার হচ্ছেন আমাদের প্রিয়তমা মা। 'মা' ডাকটি খুবই মধুর। শুনতে যেমন মধুর তেমনি ডাকতেও খুবই মজার। আমাদের দেশের ভাষা কিন্তু মায়ের ভাষা। এই মায়ের ভাষার জন্য অনেক চাচ্চুদের শহীদ হতে হয়েছে।

আম্মু তুমি লক্ষ্মী! এই মধুর কথাটি প্রথম শিখি T.Vতে এ্যাংকর দুধের এ্যাড দেখে। যখন মার কাছে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি পাই তখন মাকে Thank you - না বলে আম্মু তুমি লক্ষ্মী! বলি।

তখন আমার আম্মুও আমাকে ছোট আম্মু লক্ষ্মী! বলে জড়িয়ে ধরে আদর করে। তখন আমার খুব ভালো লাগে।

আমার মা আমার কাছে সবচে' প্রিয় লক্ষ্মী। কারণ মা আমাকে সত্য কথা বলা শিখিয়েছেন এবং ভালো মন্দ সব কথা লুকাতে মানা করেছেন।

আমি ছোট হলেও আমার নিকট মা মিথ্যা কথা বলেন না। সেই সাথে কোন কিছ গোপন করেন না। তাই আমি আমার আম্মুর জন্য সারা জীবন দোয়া করব।

**মাকে নিয়ে আমার কবিতা ঃ**

মাকে নিয়ে অনেক গল্প
অল্প করে লিখা যায়
যদি বেঁচে থাকেন আসল মা।
মা যে আমার জীবন মরণ
লক্ষ্মী আমার মা।

**- ফারিহা ফাইরুজ সিরাজী, চট্টগ্রাম**

# খেলাফতের আনুগত্য হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) -এর নির্দেশের আলোকে

আল্লাহ্‌তাআলা সূরা নূরে বলেছেন, "তোমরা রসূলের আহ্বানকে তোমাদের মধ্যে তোমাদের একে অপরকে আহ্বান করার ন্যায় মনে করিও না" (২৪ঃ৬৪)। এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) তাঁর তফসীরে উল্লেখ করেন "তোমাদের কানে খোদার রসূলের আওয়াজ আসার সাথে সাথে তার উত্তর দাও এবং সে কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য দৌড়াও। এর মধ্যে তোমাদের উন্নতির রহস্য নিহিত। এ সময় কেউ যদি নামাযরত অবস্থায় থাকে তারও কাজ হ'ল নামায ছেড়ে দিয়ে রসূলের ডাকের উত্তর দেয়া। এ আদেশ পদ-মর্যাদা অনুসারে খলীফাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাদের ডাকে একত্র হওয়া খুবই জরুরী"। তিনি বলেন, "এরূপ মনে করো না যে, ছোট ছোট আদেশ পালন না করলে কিছু আসে যায় না। এটা বড় ভুল। যে ছোট আদেশ মানে না তারপক্ষে বড় আদেশ মানা সম্ভব হয় না। খোদার সব আদেশ বড়। যেসব কাজকে লোকেরা ছোট মনে করে সেগুলির প্রতি অবহেলা ও উপেক্ষা অনেক সময় তাদেরকে না মানার ক্যান্সারে পৌছে দেয়।" তালুতের ঘটনা কুরআন মাজীদে আছে। একটি নদীর দ্বারা জাতির পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। তালুত তার জাতীকে বলে, "নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের এক নদীর দ্বারা পরীক্ষা করবেন। অতএব যে কেউ উহা হতে পানি পান করবে সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়, যে উহার স্বাদ গ্রহণ করবে না নিশ্চয় সে আমার অন্তর্ভুক্ত" (২ঃ২৫০)। অনেকে মনে করতে পারেন পানি পান করা তো কোন গোনাহ্ ছিল না। কিন্তু এখানে তাদের আল্লাহ্‌র আনুগত্য শিক্ষা দেয়াই উদ্দেশ্য ছিল। তারা যুদ্ধের জন্য যাচ্ছিল। সেজন্য তাদের পরীক্ষার আদেশ দেয়া হয়েছিল। তারা যদি এ ছোট আদেশ পালন করতে না পারে তবে যুদ্ধের সময় কীভাবে কঠিন আদেশ পালন করবে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হওয়ায় খাজা কামালুদ্দীন, মুহাম্মদ আলি ও অন্যান্য বিরোধীরা বলতে থাকে "এতো কালকের শিশু, এর কাছে আমরা বয়াত নেব। একে মেনে চলবো?" এ সম্পর্কে হুযূর (রাঃ) ইতিহাসের একটা ঘটনা উল্লেখ করেন।" কুফার লোকেরা দুষ্ট প্রকৃতির ছিল। যাদেরকে ওখানে শাসনকর্তা নিয়োগ করে পাঠান হ'ত কিছুদিন পর তাদের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে তাদের ফেরত নেওয়ার তদ্বীর শুরু করতো। হযরত উমর (রাঃ) বার বার তাদের ধৈর্যের সাথে শাসন কর্তাতে মানার আদেশ দিতেন। কিন্তু কোন লাভ হ'ত না। কুফার লোকেরা সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল। তখন হযরত উমর (রাঃ) কম বয়সের এক ব্যক্তিকে শাসনকর্তা নিয়োগ করে কুফাতে পাঠান। তার বয়স ছিল ১৯ বছর। যখন নতুন শাসনকর্তা ওখানে যান। কুফার লোকেরা হযরত উমর (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে দোষারোপ করতে লাগলো যে, হযরত উমরের (রাঃ) মাথা খারাপ হয়েছে সেজন্য একটা কম বয়সের ছেলেকে শাসনকর্তা নিয়োগ করেছেন। প্রথম দিনেই তারা শাসনকর্তাকে শায়েস্তা করার মতলব করল। দরবার চলার সময় একজন বয়স্ক লোক সাধারণ পোষাকে এসে শাসনকর্তাকে বললোঃ হযরত আপনার বয়স কত? শাসনকর্তা বিবেক প্রসূত জবাব দিলেন, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যখন উসামাকে সাহাবাদের দ্বারা গঠিত সেনাদলের কমান্ডার নিয়োগ করে সিরিয়ার দিকে পাঠান তখন তাঁর বয়স ছিল ১৭ বছর। তাঁর থেকে আমি ২ বছরের বড়। অনেক প্রবীণ সাহাবাদের তাঁর অধীনস্থ করা হয়েছিল, কুফার অধিবাসীরা এ কথা শুনে নিশ্চুপ হয়ে রইল এবং নিজেদের মধ্যে বললো, এ গভর্ণরের শাসনকালে কোন গন্ডগোল করা যাবে না। এ থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় যে, আমীরের বয়স কম হলেও তাঁকে মানাতে হবে, (বক্তৃতা মনসবে খেলাফত)।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেছেন, "খেলাফতের সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের এ নিদর্শন থাকবে যে, তাঁদের আত্মা শান্তি পাবে। পূর্বের নবী ও সাহাবাদের মত তাদের কাছে ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হবে" (মালায়কাতুল্লাহ্)।

হুযূর (রাঃ) বলেন, "হে মু'মিন ও মঙ্গলময় কাজ করার জামাত! তোমাদের জানাচ্ছি, খেলাফত আল্লাহ্‌তাআলার একটি বড় নেয়ামত তার সম্মান কর। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের বেশীরভাগ ঈমান ও সৎকর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহ্‌তাআলা তোমাদের মধ্যে এ বরকত রাখবেন" (বক্তৃতা ঃ ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৩৯)।

আমাদের উপর আল্লাহ্‌তাআলার অসীম করুণা যে, তিনি আমাদের আহমদীয়ত গ্রহণ করার তৌফীক দিয়েছেন। আমাদের এরূপ জামাতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যে সম্পর্কে হযরত নবী করীম (সঃ) এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ এ জামাতকে ভালবাসবেন এবং এর দ্বারা ইসলামকে সারা পৃথিবীতে জয়যুক্ত করবেন, তজন্য আমাদের কর্তব্য হ'ল আনুগত্যের সাথে নিজেদের খোদা-ভীতির চাদরে আবৃত করা। পার্থিব চাহিদার পরিবতে তাকওয়া হোক আমাদের বড় চাওয়া। আমাদের মুখমন্ডল হোক খেলাফতের আনুগত্যের আলোকে উদ্ভাসিত। আল্লাহ্ আমাদের ও আমাদের সন্তানদের খেলাফতের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত করুন।

সংকলন ও অনুবাদ ঃ **কাওসার আলী মোল্লা**
(সাপ্তাহিক বদর, ১৫-২২ মে ১৯৯৭-এর সৌজন্যে)

## বৃহত্তর বরিশাল-পটুয়াখালী অঞ্চলের ২য় 'ওয়াকফে নও' সম্মেলন

খোদার অশেষ রহমতে বৃহত্তর বরিশাল-পটুয়াখালী অঞ্চলের ২য় 'ওয়াকফে নও' সম্মেলন গত ৪-৫ মে রোজ শুক্র ও শনিবার পটুয়াখালী মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

উক্ত অনুষ্ঠান বাদ জমুআ কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী ওয়াকফে নও মোহতরম সাদেক দূর্গারামপুরী সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন ঃ সালহানা তৌহিদ তুবা, নজম পড়েন এস, এম, সায়হাম ফেরদৌস মুন্না। দোয়া পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় মেহমান। উক্ত অনুষ্ঠানে বৃহত্তর বরিশাল-পটুয়াখালী অঞ্চলের পটুয়াখালী, বরিশাল, খাকদন, কুকুয়া জামাতের ১০জন ওয়াকফে নও সন্তান ও তাঁদের পিতা-মাতাগণ সহ প্রত্যেক জামাতের প্রেসিডেন্ট / সেক্রেটারী, লাজনার প্রেসিডেন্ট / সেক্রেটারী, কায়েদ, জয়ীম, দায়ীইল্লাহ্ ও আতফাল নাসেরাত সহ জামাতের ভ্রাতা-ভগ্নীগণ উৎসাহের সাথে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে জুনিয়র মুরব্বী ও মোয়াল্লেম সহ বিভিন্ন জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবগণ নসীহতমূলক বক্তৃতা দেন। দু'দিন ব্যাপী সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে ওয়াকফে নও সন্তান, পিতা / মাতাগণের বিভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষা নেন কেন্দ্রীয় মেহমান ও মুরব্বী / মোয়াল্লেম সাহেব। পরীক্ষা শেষে বছর ভিত্তিতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান অধিকারী সন্তান সহ সকল সন্তানগণকে পুরস্কার / তোহ্‌ফা দেন কেন্দ্রীয় মেহমান। উক্ত অনুষ্ঠান পরিচালনা করে খাকসার।

**-শ, ম, দেলওয়ার হোসেন**
বৃহত্তর বরিশাল-পটুয়াখালী বিভাগীয় অঞ্চলের
সেক্রেটারী ওয়াকফে নও

নতুনদের পাতা

# সুন্দরবনে সাতদিন

কথায় বলে, "লোকে ভাবে এক খোদায় করে আর এক"। মনের আশা নাকি পুরণ হবার নয়। মনের আশা অবশ্যই পুরণ হয়। যদি হয় খোদার ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত। কেউ যদি লেটার পাওয়ার আশা রেখে ৫০ নম্বরের উত্তর দেয় তা হলে তো আর আশা পুরণ হবে না। নিয়্যতের সাথে আমল সম্পন্ন হবার দৃঢ়তার উপর নির্ভর করে তার সাফল্য। তাই তো আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ) বলেছেন ঃ **ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়্যত**।

২৮শে অক্টোবর, ১৯৯৮ ঈসাব্দ। ৫ জন নূতন বয়াত গ্রহণকারীর আনন্দ নিয়ে স্বর্পরাজপুর, চৌগাছা যশোরের তবলীগি সফর শেষ করে বাসায় ফিরেছি। হঠাৎ বন্ধুবর ওয়াজেদ মল্লিকের চিঠি পেলাম। লিখেছেন, অক্টোবরের ৩১তাং তাঁর বাড়ীতে পৌছাতে। শুধু আমি নই। সাথে গিন্নি, আর বন্ধু-বান্ধব যে কয়জন হয় সবাইকে সহ সুন্দরবন ভ্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে। মনটা যেন একটু কেঁপে উঠল। ক্লান্তির অবসান এড়িয়ে কয়েকজন সঙ্গি নিয়ে সময়মত পৌছে গেলাম তাঁর বাড়িতে। সময়টা ছিল দিন ও রাতের সন্ধিক্ষণ। আমাদেরকে পেয়ে পরিবারের সবার সে যে কি আনন্দ! আমার জীবনের এ এক নুতন অভিজ্ঞতা।

রাতে পরিকল্পনা হলো, 'দুবলার চর' যেতে হবে মেলা দেখতে। নভেম্বর মাসে পূর্ণিমার দিন এখানে মেলা বসে। প্রচুর লোকের সমাগম হয়। এটা হিন্দুদের একটি তীর্থস্থান বলা চলে।

দলে আমরা ১৮ জন। কলের নৌকা আগে থেকেই ভাড়া ক'রে রাখা হয়েছিল। ১লা নভেম্বর, রাত সাড়ে এগারটায় যতীন্দ্রনগর বন অফিস থেকে নৌকা ছেড়ে দিল। আমাদের দলনেতা জনাব ওয়াজেদ আলী সাহেব অত্যন্ত কর্মঠ এবং উদ্যোগী। এই সত্তর দশকে পা রাখা প্রবীণ এত দক্ষতা ও শৃঙ্খলার সাথে সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করলেন যে, তা যে কোন ব্যক্তিকে তাক্ লাগিয়ে দেবে। দোয়া করে যাত্রা শুরু হলো। মীরগাং নদী বেয়ে মাথাভাঙ্গা নদীতে পড়ি। আমাদের যাত্রা পথের বা পাশ দিয়ে সুন্দর বনের প্রাচুর্যের নিদর্শন। সত্যিই, প্রকৃতি যে এত সুন্দর বিশেষ করে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের সৌন্দর্যের যে এত ছড়াছড়ি তা না দেখে তা উপলব্ধি করা মুশ্‌কিলই বটে। বনের ভিতর অসংখ্য নদী। এ যেন ঠিক একখানা চালনী। মাথাভাঙ্গা নদী ছেড়ে ছোট একটা খালের মধ্যে ঢুকলাম। এই খালটি চুনকুঁড়ি নদীতে আমাদের পৌছিয়ে দিল। চুনকুঁড়ি বেশ বড় নদী। কিছুদুর এসেই আমরা মান্দার নদীতে পড়লাম। নদীটি অনেক চওড়া। আমাদের দলে ২ জন মৌয়াল বা বাউয়াল ছিল। তাদের ব্যবস্থাপনা ও কাজকর্ম ছিল তাক লাগানোর মত। এরা পারে না এমন কোন কাজ নেই। মাছ ধরায় এরা খুব পটু। সুন্দরবনের মধু সংগ্রহ এদের নেশা। তবে এটা তাদের অর্থকরী পেশাও বটে।

যারা চাষ করে তাদের বলি চাষী। ফুলের চাষ করলে হয় মালি। পাহাড়ে বাস করলে হয় পাহাড়ী। আর এরা! মাছ ধরে, গাছ কেটে, মধুসংগ্রহ করে আর পশু শিকার বা বাঘ তাড়িয়ে সুন্দর বনেই কাটে এদের জীবন। হয়ত একদিন বাঘের পেটেই হয় এদের চির অবস্থান। তাই তো এরা বনের বাঘকে ভাবে বাড়ীর পোষা বিড়ালের মতন। কোন ভয়ের চিহ্ন নেই তাদের চোখে মুখে।

মৌয়াল আব্দুস সামাদ আর আব্দুল মাজেদ উভয়েই শারীরিক গঠনে সুপুরুষ, সাহসী ও অত্যন্ত সহজ ও সরল। বাইরে দেখতে সহজ সরল কিন্তু ভিতরে ব্যঘ্র মূর্তি। তারা বাঘের সাথে লড়াই করে। তারা গোখ্‌রো সাপ নিয়ে খেলাও করে। এখন অনেক অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনিয়ে ক্ষণিকের তরে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছে। মনে হয় মহান আল্লাহ্ তাদের মনের পশুর সাথে লড়াই করে বশ করার ট্রেনিং দিয়ে মনুষ্য রূপী বাঘ ও সাপকে বধ করার জন্য বর্তমান জামানার হেদায়াতকারী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্‌দী (আঃ)-এর দলে যোগদান করার তৌফীক দান করেছেন।

মান্দার নদী ছেড়ে আমরা পড়লাম ফিরিঙ্গি নদীতে। এর উভয় পাশে বন। এখন সুন্দর বলার আর অবকাশ নেই কারণ, চারিদিকে শুধু বন আর বন। কোথাও লোকালয় নেই। শুধু বনের পরিসর কিচির-মিচির শব্দ আর মুক্ত অক্সিজেনে শরীরের সুস্থতা, প্রকৃতির এই বৈচিত্র সৃষ্টি করে নতুন এক আমেজ। কবির ভাষায়, "যে খেয়েছে কেওড়ার ঝোল, সে ছেড়েছে মায়ের কোল।" তবুও ঝোল খেতেই হবে। তাই সকলে মিলে প্রবেশ করলাম ফিরিঙ্গির চরের গহীন জঙ্গলে। সময় তখন সকাল আটটা। চারিদিকে অসংখ্য কেওড়া গাছ। মাজেদ কুড়াল দিয়ে গাছের ডাল কেটে দিতে লাগল। আর আমরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে কুড়ি ভর্তি করায় ব্যস্ত হলাম। আমরা ক্ষণিকের আনন্দে আত্ম-ভোলা হলেও বাওয়ালের চোখ-কান খোলা। সামাদের শিকারী কান শব্দ শুনেই বুঝতে পারল হরিণের ঝাঁক অতি নিকটে। বিপদের সম্ভাবনা বুঝতে পেরে ইশারায় নৌকায় উঠতে বলল।

আমরা অতি সন্তর্পণে ফিরে এলাম। নৌকা ছেড়ে দিল। উপস্থিত হলাম ফিরিঙ্গি নদীর অপর পারে। এখানে হবে রান্না। নৌকাটি নিরাপদ স্থানে নঙ্গর করা হ'ল। তখন সকাল সাড়ে দশটা। রান্না শেষ হ'ল। গোছল সেরে খাওয়ার পর্ব শেষ করলাম। এবার গল্প-স্বল্প ও একটু গড়াগড়ি। এদিকে ওয়াজেদ ভাই তার লোকজন নিয়ে গেলেন মাছ ধরতে। এই ফাঁকে বেয়াই সেকেন্দরকে নিয়ে একটু বনের মধ্যে ঢুকলাম। বেশী দূর নয়। নিকটে ঘুরে আবার ফিরে এলাম। জোয়ারে বনের ভিতর পানি উঠেছে। ওখানে উর্ধ্বমুখী শিকড়ের সমস্যা কম। মাটিও বেলে, হাঁটার ইচ্ছা থাকলেও দ্রুত ফিরে এলাম কারণ, বড় মামা কোথায় ওঁৎ পেতে আছে তা তো বলা যায় না। এদিকে যারা মাছ ধরতে গিয়েছিল তারা ফিরে এল বিকাল ৫টায়। সকলের মনে যেন উল্লাসের ভাব। বনে জোয়ার এল সন্ধ্যার দিকে। বনের ভিতর রান্নার পদ্ধতি দেখে অবাব হবারই কথা। মাটিতে তিন দিকে তিনটি খুঁটা পুঁতে ঐ খুটার মাথায় হাঁড়ি বসানো হয়। মাটি থেকে হাড়ির দুরত্ব প্রায় দুই ফুট। এখানে আগুন জ্বালাতে কষ্ট হয় না, অক্সিজেন সাহায্য করে। জোয়ার এসে গেল। রান্না তখনও হয় নি। আগুনের নিচে পানি প্রায় ১ ফুট হয়ে গেল। তখনও চুলা জ্বলছে।

২রা অক্টোবর সোমবার। রাতের খাবার খেয়ে ঠিক সাড়ে এগারটায় সারেং নৌকা ছেড়ে দিল। ফিরিঙ্গি নদী ছেড়ে আমরা মালঞ্চ নদী বেয়ে চরা মেঘনা নদীতে এলাম। এখানে সারেং আসির মোড়ল পুনরায় ভাঁটা হবার জন্য নৌকা নঙ্গর করল। ঘুম থেকে উঠে বা-জামাত তাহাজ্জুদ পড়ে ফজরের নামায শেষ করলাম। কিছুক্ষণ আলোচনা হলো। এরই মধ্যে আমাদের খোদ্দামের সদস্য আলতাফ হোসেন হালকা নাস্তার ব্যবস্থা করলেন। বনের যে দিকেই তাকাই না কেন আল্লাহ্‌র সাজানো বাগানের অপূর্ব সৌন্দর্য বিমোহিত করে তুলছে। মনে হয় এ যেন মহান স্রষ্টা তাঁর অস্তিত্ব ও কৌশলের নিদর্শন মানুষের জন্য স্থাপন করে রেখেছেন। এ জন্যই তিনি হয়ত

বলেছেন ঃ 'আমাকে জানতে হ'লে ভ্রমণ কর এবং দেখ জ্ঞানীদের জন্য এটা এক নিদর্শন'। যেখানে আমাদের নৌকাটি নঙ্গর করা হয়েছিল তার পাশেই গভীর জঙ্গল। বড় বড় গাছ। এখানে আছে বেশীর ভাগ কেওড়া, গরান আর বাইন। যেখানে কেওড়া গাছে ফল থাকে সেখানেই বাঘের উপস্থিতির সম্ভাবনা - হরিণ এখানে বেশী ঘোরাফেরা করে। কেওড়ার ফল ও পাতা হরিণের খুব প্রিয় খাদ্য।

এবার দুপুরের খাওয়ার আয়োজন। ওয়াজেদ ভাই ৪/৫ জন নিয়ে মাছ ধরতে গেলেন। প্রায় ঘন্টা দুয়েক পরে ফিরে এলেন। বিভিন্ন জাতের মাছ যেমন চিংড়ি, পারশেল ও আরও অন্যান্য নাম না জানা অনেক ছোট ছোট মাছ। দুপুরে খাওয়া হলো এই মাছের তরকারি আর কেওড়ার ঝোল। বেশ মজা করেই সবাই খেল। সামাদ রান্নায় বেশ পাকা। সারাক্ষণ সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে মাছ ধরা, জঙ্গল থেকে জ্বালানী সংগ্রহ করা এবং রান্না করে পরিবেশন ইত্যাদি কাজে বড় নিপুণতার পরিচয় সে দিচ্ছে। সত্যিই মনে রাখার মত! অনেক দেশ ভ্রমণ করার সুযোগ পেয়েছি, মাঝে মাঝে দলবদ্ধভাবে প্রসদ্ধি স্থানগুলো দেখতে গিয়েছি কিন্তু এই অর্ধ-শিক্ষিত গ্রাম্য লোকদের ভিতর যে পবিত্র আন্তরিকতার ছোঁয়া পেয়েছি তা আর কখনও পাই নি।

আজ মঙ্গলবার। নভেম্বরের ৩ তারিখ। পড়ন্ত বেলা। কথা হলো আজ সবাই যাব নদী বেয়ে দু' ধারের বন দেখতে আর মাছ ধরতে। ৩টায় বের হলাম। এখানকার নদীগুলি মাঝারি ধরনের। পাড়গুলি ঢালু ও অত্যন্ত পরিষ্কার। তবে বালু নয়। ভাটার সময় মনে হয় কে যেন লেপে রেখেছে। পড়ন্ত বেলার সূর্য রশ্মি এ দৃশ্যকে আরও মোহনীয় করে তুলেছে। বিশেষ করে পাড়ের ঠিক ঢালু রেখা থেকেই ছোট ছোট একহারা গাছের সারি। ভিতরে আবার বড় বড় গাছ। তা-ও সংখ্যায় কম নয়। অসংখ্য গাছের সমারোহ বিশাল এলাকা নিয়ে একইভাবে বিস্তৃত। দেখলে শুধু মনই জুড়ায় না, ভাবিয়ে তোলে প্রকৃতির এই দুর্বোধ্য কর্মকান্ডের প্রতি। মনে হয় কোন কারিগর তাঁর শৈল্পিক হস্তের সুনিপুণ কৌশল প্রয়োগ করে এ আঙ্গিণা সাজিয়ে রেখেছেন অনাহুত মেহমানদের আপ্যায়ন করার জন্য যার নতুনত্বের মলিন হওয়ার কোন সুযোগ নেই। নেই এর ভাবের ও ব্যাপ্তির কোন শেষ।

এবার আমরা এলাম 'ফটকের দনে' নদীর মুখে। যাকে নিয়ে আমাদের দেশে আছে অনেক ছড়া। বেদেরা বলে, "ফটকের নানির তামাকের কৌটা।" এ নদীতে মাছ ধরতে নেমে গেল মাজেদ, সামাদ ও সুবোল। বিকেল ৫টার দিকে ওদের মাছ ধরা শেষ হলো। এই এলাকায় হরিণের আমদানীও বেশী আবার বাঘের ভয়ও তেমনি। তারা তড়িঘড়ি করে রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। যেহেতু রাত ১০টার জোয়ারে নৌকা ছাড়তে হবে। এদিকে নদীগুলিও বেশ চওড়া। আমাদের ট্রলারটি আকারেও ছোট আবার বেশ পুরানো। তাই অনেকেই সমুদ্রের ঢেউয়ের মোকাবেলায় নৌকাটির পারঙ্গমতায় মানসিকভাবে ভীত ও সন্ত্রস্ত ছিল। কিন্তু দুবলার চরে যেতে হবে, মেলা দেখতে হবে এ খুশীও মন থেকে সরানো যাচ্ছে না। ভয়কে সামাল দিয়ে মহান আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া ও প্রার্থনা করে রওনা দিলাম দুবলার চরের পথে। সময় তখন রাত ১১টা। দোয়া পরিচালনা করলেন আমাদের আমীরে কাফেলা জনাব ওয়াজেদ আলী সাহেব। ফটকের দনে নদী পার হয়ে আমরা চর পাকাসিয়া নদীতে পড়লাম। বিশাল নদী। চাঁদনী রাত। দেখতে ভালই লাগছিল। দু'ধারে বনের শোভারাজি ও অথৈ পানির ঢেউয়ের মাঝে পূর্ণ চাঁদের লুকোচুরি খেলায় মন যেন বর্তমানকে হারিয়ে ফেলেছিল। কোন ফাঁকে নৌকার সামনের চরাটের উপর বসেছি জানি না। এই প্রবীণ বয়সে চাঁদনী রাতের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য থেকে চোখ উঠাতে পারছিলাম না। হঠাৎ দেখি পাশে বেয়াই। আড্ডা জমল ভাল। রাত দুটো পর্যন্ত নানা কথার তোড় মেরে যাচ্ছিলাম। মৃদু বাতাসের কোলাকুলিতে চোখের পাতা দু'টির মিলন থামাতে না পেরে বিছানায় পাশ দিতে হ'ল। একটানা ঘুম। ঠিক চারটায় চোখ খুলে গেল। বা-জামাত তাহাজ্জুদ ও ফজর পড়লাম। ইতোমধ্যে আমরা শিবশাহ ও পশুর নদীর মোহনায় পৌঁছে গেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের ভ্রমণতরী এসে ভিড়ল সেই কাঙ্ক্ষিত দুবলার চরে। ৪ঠা নভেম্বর। সকাল ৬টা। চাঁদ যে আমাদের পৌঁছে দিয়ে সরে পড়ায় ব্যস্ত। সকালের চা-নাস্তা সেরে বেরুনোর ব্যবস্থা করলাম। সৈকতের দিকে তাকিয়ে দেখি মেয়ে, পুরুষ মিলে ডাব, লেবু, মিষ্টি ইত্যাদি ইষ্ট খুশীর রসদ নিয়ে সমুদ্র দেবতাকে খুশী করার জন্য সামনে রেখে বজ্রাসনে দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বসে আছে। যুবতী মহিলারাও প্রাতঃ অবগাহনে সকল পাপ সমুদ্র জলে রেখে যেতে ব্যস্ত।

কথিত আছে যে, কোন এক মগ রাজা তার একমাত্র পুত্রকে বড় ঘটা করে বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কোন পুত্র সন্তান না হওয়ায় রাজপুত্র মানসিক অশান্তিতে ভুগতে লাগল। রাজ পরিবারের সকলেই কেমন বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। রাজ পুত্রের ছিল এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে তাকে সব সময় আগলে রাখত এবং সান্ত্বনা দিয়ে খুশীও রাখার চেষ্টা করত। একদিন সে রাজপুত্রকে বলল, বন্ধু, এক কাজ কর। চল, আমরা সমুদ্র ভ্রমণ যাই। খোলা বাতাসে কয়েক দিন ঘোরা-ফেরা করলে হয়ত মনটা ভাল হবে। যে কথা সেই কাজ। এই প্রস্তাব রাজার কাছে দেয়া হলো। রাজা রাজী হলেন। যথাসম্ভব পুত্রের ভ্রমণের সকল ব্যবস্থা সময়মত করে দিলেন। রাজপুত্র বন্ধুকে নিয়ে সমুদ্রও ভ্রমণে বের হ'ল। চলতে চলতে তারা এক চরে এসে নামল। লোক-লস্কর সাথে ছিল তো অনেক। তারা সবাই খাবারের ব্যবস্থায় মশগুল হ'ল। বন্ধুটি মাছ ধরতে গেল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল সে, সে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে মাছ পায় তবে সবচেয়ে বড় মাছটি সমুদ্রে ছেড়ে দেবে। সত্যি সত্যিই জালে প্রচুর মাছ পেল। বন্ধুটি তো মহাখুশী। কথামত বড় মাছটি ছেড়ে দিল। অবশিষ্ট মাছ রান্না হ'ল এবং বন্ধুকে নিয়ে মজা করে খেল।

বন্ধুকে রাজকুমারকে বলল, তুমিও জল দেবতার কাছে কিছু চাও না, হয়ত তোমার এই বদনাম কেটেও যেতে পারে। রাজকুমার সম্মত হয়ে জলদেবতার কাছে প্রার্থনা করলেন। যদি আমার পুত্র সন্তান হয় তবে পূর্ণ জ্যোৎস্নার রাতে তাকে এই সমুদ্র জলে ভাসিয়ে দেব। দুই বন্ধু বাড়ী ফিরে এল। বেশ খুশী-খোশালীতে দিন কাটতে লাগল। রাজ নন্দিনী যথা সময়ে গর্ববতী হলেন ও ফুট ফুটে চাঁদের মত এক পুত্র সন্তান ঠিক সময় মত প্রসব করলেন। রাজা তো মহাখুশী। কিন্তু রাজ পুত্রের মনে কোন আনন্দ নেই। সব সময়ই যেন কি এক দুঃশ্চিন্তায় মগ্ন। নীরবতাই তার একমাত্র সাথী। রাজা-রানী কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না।এই সুখ-সাগরে দুঃখের ভেলা কেন ভাসছে। একমাত্র পুত্রের বিমর্ষ মুখচ্ছবি মায়ের হৃদয়ে শেলের মত ফুটছে। রাণী রাজাকে বললেন, ওগো! তুমি বল না, কেন আমার ছেলে এমন করছে, কি হয়েছে তার? অবশেষে বন্ধুর অনুরোধে রাজকুমার পিতার কাছে পুত্র-জন্মের কাহিনী ও প্রতিজ্ঞার কথা খুলে বলল। রাজা দুঃখে ভেংগে পড়লেন। একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ়! রাণী

রাজপুত্রের প্রতিশ্রুতির কথা শুনে কান্না শুরু করলেন। রাজ মহলে কান্নার রোল পড়ে গেল। চারিদিকে বিমর্ষের ছায়া নেমে এল। রাজ কুমারের স্ত্রী তো শুনেই জ্ঞান হারা হয়ে পড়লেন। এই মর্মান্তিক শোকাকুল পরিস্থিতিতে রাজকুমার মনোবল অটুট রাখলেন এবং অঙ্গীকার অনুযায়ী সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। রাজপুত্রের দৃঢ়তার কারণে রাজা প্রতিজ্ঞা সম্পাদনে সম্মত হলেন এবং লোক লস্করসহ রানীকে সাথে নিয়ে তাঁর একমাত্র বংশধরকে ভাসিয়ে দিতে উপস্থিত হলেন সেই প্রতিশ্রুত চরে। পরের দিন ভোরেই পূর্ণ-জোৎস্না। রাজা পুত্রকে যথা সময়ে তদীয় একমাত্র সন্তানকে জলে ভাসিয়ে দিতে ইশারা করলেন। রাজপুত্র বন্ধুকে সাথে নিয়ে স্ফীত জোয়ারে স্বীয় প্রাণাধিক একমাত্র উত্তরাধিকারীকে ভাসিয়ে দিলেন। শিশুটি চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল। সবাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। এ অসহনীয় জ্বালায় রানী পুত্র বধুকে জড়িয়ে ধরে অশ্রুবারি ঝরাতে লাগলেন। সকলেই শোকাভিভূত। অনেকেই আস্তানায় ফিরে এলেন। কিন্তু পুত্রবধু যথা আসনে আসীন। কেউ তাকে তার জায়গা থেকে উঠাতে পারলেন না। তিনি যোগাসনে মাথা নীচু করে উপুড় হয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ এইভাবে কেটে গেল। হঠাৎ পুত্র বধু তার হাতে একটা মানব শিশুর অস্তিত্ব অনুভব করলেন। তার আসনের জায়গা জোয়ারে ভেসে গেছে। কোমর পর্যন্ত পানি। সম্মুখে বিস্তৃত দু'হাতের তালুতে নিজ পুত্রকে পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে চীৎকার করে উঠলেন-"ওগো তোমরা কে কোথায় আছ দেখ, আমার সোনা মণিকে ফেরত পেয়েছি। সমুদ্র দেবতা আমার নয়নের মণিকে আমার কোলে ফিরিয়ে দিয়েছে। সবাই দৌড়ে এলেন। সত্যি সত্যিই ছেলেকে কোলে দেখে সবাই তো হতবাক্। রানী তো স্পর্শ করে ভালভাবে নেড়ে-নেড়ে তবে আশ্বস্ত হলেন। রাজা খুশীতে বাগ বাগ। সবাই উল্লাসে মাতরস্। সমুদ্র উপকূলে উল্লাসের ঢেউ খেলে গেল। সেই থেকে এই দুবলার চরে প্রতি বছর মেলা বসে। পূর্ণিমার এই লগনে হিন্দুরা তাদের স্ব স্ব সমস্যা নিরসনের জন্য সমুদ্র দেবতার কাছে নানাবিধ ফল, মিষ্টি দেবতার জন্য সামনে সাজিয়ে রেখে সারি দিয়ে বসে। জোয়ার এসে সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। যদি কারও প্রসাদের বস্তু তার কাছে আবার ফিরে আসে তবে দেবতা তার প্রার্থনা গ্রহণ করেছে এবং প্রার্থনাকৃত রোগ-বালাই বা সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস করে। এই হ'ল দুবলার চরের ইতিকথা যা স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত।

এমন কাহিনী শুধু এখানেই নয়, বিশ্বের সব জায়গায়ই কিছু না কিছু শ্রুত আছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের আনাচে কানাচে এরূপ হাজার হাজার কল্প-কাহিনী শোনা যায়। সমাজের সকল স্তরের মানুষ এহেন মায়াবী কাহিনীর প্রতি এত আকৃষ্ট যে, সমাজের জ্ঞানী গুণীরাও নিমজ্জনের হাত থেকে রেহাই পায় নি। তারা এর তোড়ে প্রকৃত জ্ঞানকে হারিয়ে অজ্ঞানতার পংকিলে এমনভাবে নিমজ্জিত যে, এ অজ্ঞানতার চাদর কোন দিন উন্মোচন হবে কি-না তা সাধারণ সচেতন হৃদয়কে আতংকিত করে তুলেছে। আগুনের চেয়ে তেজালো ওদের দাহ্যশক্তি। কোন মানুষের পক্ষে এই অপশক্তিকে উপড়িয়ে ফেলা সম্ভব নয়। কারণ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ এ ক্ষমতা কোন মানব সন্তানকে দেন না যতক্ষণ না তিনি তা ইচ্ছা করেন। মানুষকে এই সংকটকাল থেকে উদ্ধার করতে যখনই তিনি সংকল্প করেন। তখনই তিনি মানুষের মধ্যে হতে তাদের নাজাতের জন্য একজন নবী বা রসূল প্রেরণ করেন। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ **'ওয়া লি কুল্লি উম্মাতি রসূলান** অর্থাৎ প্রত্যেক উম্মাতের জন্যেই রহিয়াছে রসূল - তাহাদের হেদায়াতের জন্য। (১০ঃ৪৮)। হাদীসে আছে ঃ **ইন্নাল্লাহা ইযাবআসু লিহাজিহিল উম্মাতি আলা রাসি কুল্লি মিয়াতি সানাতিম্মাই ইউজাদ্দি দুলাহা দিনাহা**। অর্থাৎ ঃ আল্লাহ্ উম্মতের জন্য প্রত্যেক একশ' বছরের শিরোভাগে ধর্মের যে অংশে অনাচার দেখা দেয় সংস্কার করার জন্য সংস্কারক প্রেরণ করেন। অতএব যুগ-ইমাম বা যুগ সংস্কারককে চেনা এবং তাঁকে অনুসরণ করা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। আল্লাহ্ রহমানির রহীম। তিনি তাঁর বান্দাদের অধঃপতন থেকে রক্ষার জন্য সর্বদা প্রস্তুত। তাঁর দয়ার কোন বিরতি নেই। অতএব যতশীঘ্র তাঁর রহমতের আওতাভুক্ত হওয়া যায় ততই মঙ্গল। হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ "এবং অতীতের সমুদয় ঐশী নিদর্শন কিস্সা কাহিনীতে পরিণত হইয়া গিয়াছে।" (ক্রমশঃ)

– আলহাজ্জ মোশাররফ হোসেন মোল্লা

## চট্টগ্রাম বিভাগ-১ এর ২য় বার্ষিক ওয়াকফে নও সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ৪-০৫-২০০১ইং তারিখে রোজ বৃহস্পতিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার মৌড়াইলস্থ মরহুম সৈয়দ সালেহ আহমদ সাহেবের বাড়ীতে চট্টগ্রাম বিভাগ-১ এর ২য় বার্ষিক সম্মেলন অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহতরম মোঃ সাদেক দূর্গারামপুরী, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও। ৩টি পর্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের ১মটি ছিল উদ্বোধনী, ২য়টি প্রতিযোগিতা পর্ব ও ৩য়টি ছিল সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী পর্ব। উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করে মোহতরম খন্দকার সাঈদ আহমদ, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বি, বাড়ীয়া। আগত পিতা-মাতা ও শিশুদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন মোহতরম মোঃ সাদেক দূর্গারামপুরী সাহেব, মজিদুল ইসলাম মোয়াল্লেম সাহেব। পরিশেষে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ও উপস্থিত শিশুদের পুরস্কার বিতরণ করেন মোহতরম সভাপতি সাহেব।

- সেক্রেটারী, বিভাগীয় ওয়াকফে নও সম্মেলন

# সমাজ ব্যবস্থায় হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর অবদান

সুখ-শান্তির সমাজ, উন্নত ও প্রগতিশীল সমাজ কল্যাণ ও মঙ্গলময় সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য সমাজের জনসাধারণের মধ্যে যেসব গুণ থাকা দরকার তা হলো, সদ্ভাব-সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য-ভ্রাতৃত্ব, একতা ও শৃঙ্খলা,পরস্পর সহযোগিতা ও সাহায্য সহায়তা। আরো প্রয়োজন হয় কনিষ্ঠদের প্রতি জ্যেষ্ঠদের প্রভাব, কনিষ্ঠদের প্রতি জ্যেষ্ঠদের স্নেহ-মমতা এবং শ্রেণীগত বিভেদের মূল উচ্ছেদ। এবং যে বিষয়টির বিশেষ প্রয়োজন হয় তা হলো শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং জ্ঞান বিস্তারের সুব্যবস্থা। সুতরাং সুখ সমৃদ্ধিশালী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে সমাজের প্রতিটি মানুষকে ঐ সব শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তাদেরকে বুঝিয়ে সুজিয়ে ঐসব গুণাবলী ধারণের প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে। এ পথে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যেসব শিক্ষা ও আদর্শ আমাদের জন্য নমুনাস্বরূপ রেখে গিয়েছেন তা বিস্তারিতভাবে জানা একান্ত প্রয়োজন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, 'হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কারো প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধে কখনোই দুর্ব্যবহার করতেন না। বরং কেউ তাঁর প্রতি দুর্ব্যবহার করলে তা ক্ষমা করতেন এবং অন্তর হতে মুছে ফেলতেন" (তিরমিযী)।

হযরত নবী করীম (সঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি সদয় না হয় আল্লাহ্ও তার প্রতি সদয় হবেন না" (বুখারী)।

ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে নসিহত করতে যেয়ে হুযূর (সঃ) বলেছেন, মু'মিনগণকে সকলে মিলে-মিশে একটি দেহে রূপান্তরিত হতে হবে। উহার চোখে আঘাত লাগলে সমস্ত দেহেই আঘাত লাগবে। মাথায় যাতনা হলেও দেহে যাতনা শুরু হবে" (মুসলিম)।

সমাজের অসহায় মানুষের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মজলুমের চিরসাথী নবী করীম (সঃ) বলেছেন, "নিঃসহায় এতীম এবং বিধবাদের সহায়তাকারী ঐ ব্যক্তির সমতুল্য যে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করে বা সমস্ত রাত নামায আদায় করে ও প্রতি দিন রোযা রাখে" (বুখারী)।

কোন ব্যক্তির প্রয়োজন পুরণ করার লক্ষ্যে মুহাম্মদ (সঃ) ছিলেন সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী। এ বিষয়ে তাঁর বাণী হলো ঃ

"যে ব্যক্তি অপরের প্রয়োজন মিটাবে আল্লাহ্ তার প্রয়োজন মিটাবেন। যে-ব্যক্তি অপরের একটি দুঃখ দূর করবে আল্লাহ্ কিয়ামত দিবসে তার অনেক দুঃখ দুর করবেন। যে-ব্যক্তি অপরের মান-ইজ্জত রক্ষা করবেন আল্লাহ্ নিজে তার মান-ইজ্জত রক্ষা করবেন, (বুখারী)। ভাল মানুষের সংজ্ঞা প্রদান করতে যেয়ে হুযূর পাক (সঃ) যে কথা বলেছেন, তাহলো ঃ "যে লোক হতে ভালোর আশা পোষণ করা যায় এবং মন্দের ভয় না থাকে সে-ই তোমাদের মধ্যে উত্তম মানুষ। পক্ষান্তরে যে-ব্যক্তি হতে ভালোর আশা না থাকে এবং মন্দের আশঙ্কা থাকে সে-ই তোমাদের মধ্যে খারাপ মানুষ" (তিরমিযী)।

মুসলমানের প্রতি মুসলমানের হক সম্বন্ধে হুযূর (সঃ) বলেছেন ঃ মুসলমানদের পরস্পর দাবী হলো ছয়টি; যথা (১) সাক্ষাতে সালাম বিনিময় করবে, (২) আহ্বান করলে সাড়া দিবে, (৩) সাহায্য প্রার্থীকে সাহায্য করবে, (৪) হাঁচি দিয়ে **আলহামদুলিল্লাহ্** বললে **ইয়ারহামুকুমুল্লাহ্** বলে দোয়া করবে, (৫) রোগে শোকে খোঁজ-খবর করবে, ও (৬) মৃত্যুবরণ করলে দাফন-কাফনে শরীক হবে (মুসলিম)।

হযরত আয়শা (রাঃ) উল্লেখ করেছেন, নবী করীম (সঃ) রুগী দেখতে যেতেন, জানাযার সঙ্গে গমন করতেন, কোন দাস যদি তাকে দাওয়াত করত তিনি তা-ও গ্রহণ করতেন (বুখারী)।

অনেকে সদ্ব্যবহার করার সময় চিন্তা করে যে, যার সাথে সদ্ব্যবহার করছি তার কাছ থেকে সদ্ব্যবহার পেতে হবে। কিন্তু নবী করীম (সঃ) তাদের সাথে একমত নন কারণ তিনি বলেছেন,"সদ্ব্যবহারের বিনিময়ে সদ্ব্যবহার করার নাম সদ্ব্যবহার নয়, যে অসদ্ব্যবহার করেছে তার সাথে সদ্ব্যবহার করার নামই সদ্ব্যবহার"।

মুসলিম শরীফের এক হাদীস হতে জানা যায় যে, হুযূর (সঃ) বলেছেন, "মুসলমান পরস্পর ভাই-ভাই একে অন্যকে ঘৃণা করবে না।" বুখারী শরীফে বলা হয়েছে, "ইসলাম ধর্মের সর্বাপেক্ষা বড় কাজ হলো প্রত্যেক মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গল কামনা করা"। সমাজের সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি ছোটদেরকে স্নেহ না করবে এবং বড়দেরকে শ্রদ্ধা না করবে এবং সৎ কাজের আদেশ না দেবে অন্যায় কাজে বাধা না দেবে সে আমার উম্মত হতে খারিজ হয়ে যাবে" (মিশকাত)।

সমাজের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ সেবক হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজের যারা সেবক তাদের সম্বন্ধে বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোন লোককে খুশি করার জন্য তার প্রয়োজন মিটাবে সে বস্তুত আমাকে খুশী করেছে। আর যে আমাকে খুশী করেছে সে বস্তুত আল্লাহ্কে খুশি করেছে। আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন" (মিশকাত)।

তিনি আরো বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করবে আল্লাহ্তাআলা তার জন্য তিহাত্তরটি মাগফিরাত লিখে দিবেন, উহার একটি দ্বারাই তার সব বিষয়ের শুদ্ধি ও সুষ্ঠুতা লাভ হবে আর বাহাত্তরটি দ্বারা কিয়ামত দিবসে উন্নতি হবে" (মিশকাত)। মিশকাত শরীফের অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "যে আল্লাহ্র বান্দাদের উপকার করবে, সে-ই আল্লাহ্র প্রিয় হবে।"

দুনিয়ার আসক্তিতে যারা মত্ত তাদের সম্বন্ধে মুহাম্মদ (সঃ)-এর নসিহত হলো ঃ "অন্যের দোষ অনুসন্ধান করবে না, কারো কোন নিন্দা করবে না, হিংসা ও শত্রুতার রাস্তা পরিহার করবে। কারো দোষ চর্চায় ও শ্রবণে কোনরূপ আগ্রহ প্রদর্শন করবে না। দুনিয়াতে সম্পদ বাড়ানোর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে না। সর্বদা মানুষের সাথে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করতে তৎপর থাকবে" (বুখারী)।

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় রত ব্যক্তিদের জন্য বলেছেন, "সমাজের মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্য ও সদ্ভাব বজায়ে রাখতে যত্নবান হওয়ার পুণ্য নামায রোযা ও দান-খয়রাতের পুণ্য অপেক্ষা অধিক। পক্ষান্তরে পরস্পরের সম্পর্ক খারাপ হলে সুখ-শান্তি ও দীন-ঈমান সব বিদায় করে দেয়" তিনি আরো বলেছেন, "যে-ব্যক্তি অন্যের ক্ষতি করতে চায়; আল্লাহ্তাআলা তার ক্ষতি সাধন করে থাকেন। যে-ব্যক্তি অন্যের জীবন সংকীর্ণ করার চেষ্টা করবে, আল্লাহ্ তার জীবন সংকীর্ণ করে দিবেন" (তিরমিযী)।

সমাজে এমন কিছু লোক বাস করে, যারা সহজ সরল মানুষকে নানাবিধ ছলচাতুরীর মাধ্যমে ধোঁকা বা প্রতারিত করে থাকে, তাদের বিষয়ে হুযূর (সঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে ধোঁকা দেয় বা তার ক্ষতি করে, তার প্রতি অভিশাপ" (তিরমিযী)।

অনেক সময় দেখা যায় সমাজের কোন ব্যক্তি এমন একটি দোষ করেছে যা শুধু মাত্র নিকটতম কোন ব্যক্তির দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এক্ষেত্রে উত্তম কাজ হলো দোষী ব্যক্তিকে

বুঝিয়ে ঐ দোষ হতে বিরত করা কিন্তু অধিকাংশ সময় এর উল্টোটা করা হয়। অর্থাৎ ঐ দোষি ব্যক্তিকে সমাজে অপদস্থ করার উদ্দেশ্যে তার দোষ-ত্রুটি প্রচার করার কাজে লেগে যাওয়া হয়। এ ধরনের দোষ প্রচারকারীদের সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি তার ভ্রাতার দোষ তালাশ করে প্রকাশ করবে আল্লাহ্‌তাআলা তার দোষও প্রকাশ করবেন। এমনকি গৃহাভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকলেও তাকে লাঞ্ছিত করবেন" (তিরমিযী)। তিনি আরো বলেছেন, ঈর্ষা পোষণ হতে দূরে থাকবে; কারণ "ঈর্ষা মানুষের নেক আমলকে বরবাদ করে দেয়, যেরূপ অগ্নি শুষ্ক কাষ্ঠকে ভস্মীভূত করে দেয়" (আবূ দাউদ)।

কোন উলিল আমর কর্তৃক যখন সমাজের কোন বিচার করা হয় তখন যারা সেই বিচার কার্যকে অমান্য করে, আপোষ-মীমাংসায় অবজ্ঞা প্রদর্শন করে তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র হাবীব মুহাম্মদ (সঃ)-এর বাণী হলো ঃ "প্রতি সপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতিবার মানুষের আমলনামা আল্লাহ্‌র নিকট পেশ করা হয় এবং ঐ সময় অনেক বান্দার গুনাহ্ মাফ করা হয়। কিন্তু এমন দু'জন বান্দা যাদের মধ্যে অসদ্ভাব সৃষ্টি হয়েছে, তাদের সম্বন্ধে বলা হয়, সদ্ভাবের প্রতি তাদের প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত তাদের ক্ষমা করা হবে না" (মুসলিম)।

সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠার সহজ উপায় সম্বন্ধে মহানবী (সঃ) বলেছেন, "তোমরা মু'মিন না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং মু'মিন হতে পারবে না পরস্পর ভালবাসা ও সদ্ভাবের সৃষ্টি না করা পর্যন্ত। আমি কি তোমাদের এমন একটি কাজের পরামর্শ প্রদান করব, যা করলে পরস্পর ভালবাসা ও সদ্ভাবের সৃষ্টি হবে- উহা হলো তোমরা পরস্পর 'সালাম' বিনিময়ের নীতিকে বেশি বেশি প্রসার দান করবে" (মুসলিম)।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সামাজিক ব্যবস্থার অবদান বিষয়ে মুজাদ্দিদে আযম মুহাম্মদী মসীহ্ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) তাঁর রচিত নাজমুল হুদা পুস্তকের ১৫-১৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন ঃ "তাঁর অনুপম ক্ষমতা দর্শনে হয়ত কেহ বিস্মিত হতে পারেন, কীভাবে তিনি সহচরদের বেছে নিয়েছিলেন মর্ত্যের গভীরতম তলদেশ হতে, আর কীভাবে তাদের স্বর্গের উচ্চতম আসনে সমাসীন করেছিলেন, কীভাবে তাদেরকে ধাপে ধাপে উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত করেছিলেন। ঐশী একত্ব ও ঐশী গুণ-রাজি সম্বন্ধে যাদের কোন ধারণা ছিল না এমনি পশুর জীবন যাপন করতে যাদের তিনি দেখেছিলেন, যারা পাপ ও পুণ্যের পার্থক্য করতে জানত না তাদের তিনি মানবতা অর্জনের নীতি শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাদের নিকট সমাজ ও জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করলেন আর করালেন স্বাস্থ্যবিধি, বিবাহ-বন্ধন রীতি, সাংসারিক মিতব্যয়িতা, খাদ্য-পরিধেয় রীতি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, রোগ নিবারণ ও চিকিৎসা বিধি এবং সাধারণভাবে সব বিষয়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ। যখন দেখলেন যে, তারা দৈহিক নিয়মাবলীতে পরিপক্কতা অর্জন করেছে, তখন তাদেরকে তিনি নৈতিকতা এবং পরে আধ্যাত্মিকতা শিক্ষা দিলেন। আর আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ সাধনে নিয়ন্ত্রিত আচার-বিধির ব্যবস্থা করলেন। অতঃপর তারা নৈতিকতায় বলীয়ান এবং সদাচরণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেছে তখন তিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে ও তাতে বিলীন হয়ে যাবার আহ্বান জানালেন। ঐশী-জ্ঞান লাভের জন্য উৎসাহ দান করলেন। আর সেই শক্তিময় পরম সত্তার দিকে পরিচালিত করলেন যাতে তারা স্বাধীনভাবে তাঁর অনুমোদন ও সম্মতি সাপেক্ষে ঐশী প্রেম-সুধা ও সাহচর্য লাভ করে"।

পরিশেষে শেখ সাদী (রহঃ)-এর একটি পংক্তি দ্বারা প্রবন্ধের ইতি টানছি। সাদী (রহঃ) বলেছেন ঃ "অসম্ভব, হে সাদী, অসম্ভব। মুস্তাফা (সঃ)-এর শিক্ষাঙ্গণের দ্বারে না এসে এবং সেই বাদশাহের আংগুরি মোহর ধারণ না করে কেউই বেহেশ্‌তের পানে সঠিক, সরল ও সোজা পথে চলতে পারবে না। কেননা, বহিরাগতদের জন্য বেহেশ্‌তের সুগন্ধ পাওয়াও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রদর্শিত সামাজিক কর্মপদ্ধতিকে যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তি, সমাজ, জাতীয় ও বিশ্বজনীন জীবন ধারায় সংযুক্ত করা না হবে, ততক্ষণ সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে।

**- মোহাম্মদ মজিদুল ইসলাম**
মোয়াল্লেম

## সরাইলের আহমদীয়া জামাত ঃ আমার কিছু কথা

আমার শিশুকাল পার হয়ে যখন ভাল করে বুঝ আসে তখন থেকেই জেনে এবং শুনে আসছি যে ইসলামের মধ্যে দলা-দলি আছে। তবে কাদিয়ানীরা সবচে' জঘন্য ও খারাপ। বৃটিশ আমলে আমার মরহুম পিতা সর্দার গোলাম হোসেন তৎকালীন বি-বাড়ীয়া মহকুমার গ্রাম্য একজন স্বনামধন্য সালিশ ছিলেন। তাঁর একটা নিবিড় সম্পর্ক ছিল এই কাদিয়ানী বাড়ীর সঙ্গে। আমার বয়স যখন ৬/৭ বৎসর তখন মরহুমা পিতার কাছ থেকে শুনতাম তাঁর চাচী মিসেস মীর সিকান্দর আলী এবং চাচা মরহুম সিকান্দর আলীর ভূয়সী প্রশংসার কথা। তিনি আমার আম্মা মরহুমা দৌলতুন্নেছা খানমের কাছে ঐ বাড়ীর তাঁর (আমার আব্বার) চাচী যে আদর করে বাগানের অনেক লেবু-করমচা দিতেন পুটুলীতে তা গর্ব করে বলতেন আমার মাকে আর আমি মন দিয়ে তা শুনতাম। আমি কোনদিন আমার খ্যাতিমান পিতা হতে এ বাড়ীর বিকৃত কাদিয়ানী নাম বলতে শুনি নি - শুনি নি মরহুমা আম্মা অথবা বড় ভাই-বোনদের মুখ হতে। পিতার সেই সিকান্দর চাচা আর আমার বড় ভাইদের সিকান্দর দাদা বলার পিছনে একটি কারণ ছিল। বংশানুক্রমে একটা সুসম্পর্কের জন্যে আমার পিতামহ বশির খান তার পিতা জাহাঙ্গীর খান পাঠান, তদীয় পিতা মেহরুল্লাহ খান পাঠান সিমান্তের খটক হতে বাদশা শাহজাহানের সময় ১৬২২ ইং সনে পাহাড়িয়া তস্কর আহমদেরকে দমন করার জন্য এই পূর্ব বাংলায় প্রেরিত হন। তাদের পূর্ব-পরুষ মকবুল্লাহ্ খান পাঠান ছিলেন এই উপমহাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় সাধক। সেই সুবাদেই আমার পূর্ব-পুরুষরা এই মীর খান্দানদের সঙ্গে একটা শরাফতি বা সখ্যতা রক্ষা করে আসছিল। পিতা এবং বড় চাচা হ'তে শুনে আসছিলাম মীর পরিবারের একটা পদমর্যাদার কথা। আমার এক বড় ভাইয়ের শ্বশুর বাড়ীও সৈয়াদটুলা এবং মোগলটুলা গ্রামের মীর মুকসুদ আলীর বাড়ী। তা যাহোক, বলছিলাম কাদিয়ানী বাড়ী সম্বন্ধে। আমিও ছোটবেলা থেকে বিভিন্নভাবে এ বাড়ীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বিধায় কাদিয়ানী বাড়ী হিসাবে জানতাম না জানতাম আমার পিতার চাচা এ তাঁর ভাই-বন্ধুদের বাড়ী মীর বাড়ী হিসাবে। এই বাড়ীর কাইজার মিয় বর্তমানে বাংলাদেশ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সহ আরও দু' একজন অতি ঘনিষ্ঠ সমসাময়িক বন্ধু মীর ফজলে আলী (মরহুম), মীর আলী মিয়া অর্থাৎ জনাব মীর শরীফ আলী প্রমুখ। উল্লেখ্য কর্ম জীবনের ঘূর্ণিপাঁকে পড়ে বিভিন্ন জায়গায় থাকা অবস্থায়ও এ বাড়ীর সবার সঙ্গে মধুর সম্পর্ক রক্ষা করে চলতাম আমি নিজে। এটা দোষ বা গুণ কিনা জানি না। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের খোঁজ-খবর নিবার ত্রুটি আমার পক্ষ থেকে কখনও ঘটে নি এবং আজও না। মীর বাড়ীর বড় ভাই জামাতের একনিষ্ঠ কর্মী খাদেম

মরহুম মীর জুলফিকার আলী, প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী, মরহুম মীর কামাল আলী থেকে, মোহতরম বন্ধুবর ন্যাশনাল আমীর মীর মোহাম্মদ আলী কাইজারও আমার বিচ্ছিন্নতার অপবাদ দিতে পারবে না এবং পারবে না বলেই সেই একই কারণে আমার খোলা হৃদয়ে আহমদীয়তের পয়গাম পৌঁছে আজ থেকে সাড়ে বার বছর পূর্বে। আমি সেই সময় কল্পনাতীত ব্যস্ত জীবন যাপন করছিলাম নিজ জন্মভূমি সরাইলে। যেমন একটি ইংরেজী পত্রিকার রিপোর্টার, সরকারীভাবে প্রতিষ্ঠিত প্রশিক্ষণমূলক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক এবং সরাইল কলেজের বাণিজ্য বিভাগের প্রশিক্ষক এবং মুজিব নগরে প্রতিষ্ঠিত ঢাকাস্থ একটি বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিকের 'এই সমাজ বদলাইতে হইবে' শিরোনামে একটি উপ-সম্পাদকীয়ের নিয়মিত লেখক। ইহা ৮৩ থেকে ৯০ ইং সনের কথা। এই কর্মব্যস্ততা আর চব্বিশ ঘন্টা লিখা-লিখির কারণে মোটা কাল ফ্রেমের চশমার চাপে দুই কানের স্পেইজে যা দেখা দেয় অতিরিক্ত ফ্রেমের ঘষা ঘষিতে। সাতাশী সনে আমার কলেজের ছাত্র মাহমুদ ফারুকী রোবেল যে কলেজে স্যার বাইরে মামা মামা ডাকত তার হাতে "কিশতিয়ে নূহ" নামক একখানি বই দেখে চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী লোভ হ'ল বইটার প্রতি। বইটি হাতে নিয়ে এর গেটআপ সূচী ও আধ্যাত্মিকতা দেখে নিলাম এবং তাকে সহ টেকনিকেল প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটের খবরদারী করার জন্য রওয়ানা দিয়ে রিক্সা হতে নেমে ছাত্র- ভাগীনা রোবেলকে বিদায় দিলাম; যদিও সে-ও এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শর্টহ্যান্ড বিভাগের ছাত্র ছিল।

ইনষ্টিটিউটে প্রবেশ করে ছাত্র-ছাত্রীদের খোঁজ খবর নিলাম ব্যক্তিগতভাবে এবং মনিটারের মাধ্যমে। এই খানে ৪টি শিফট ছিল। যাক নিজ আসনে বসে ডেস্কে কিছু কাগজ এবং ঐ কিশতিয়ে নূহ বইটি রাখলাম। চা পান করতে করতে বইটির পাতা উল্টাতে লাগলাম কিন্তু মুস্কিল হ'ল চশমা ঠিকভাবে মোটেই কানের ঘা'র জন্য ব্যবহার করতে পারছি না। কিন্তু বইটি পড়ার নেশাও ছাড়তে পারছি না। কষ্ট করে চশমাটি হাতে রেখে এই বরকতময় বইটির ক'টি পাতা উল্টিয়ে উল্টিয়ে পড়তে থাকলাম। অভিভূত হ'লাম গ্রন্থকারের কলমের শক্তি দেখে। দুঃখের ব্যাপার এভাবে পড়া ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে দেখে বইটি ডেস্কের উপর রেখে হৃদয়ের কপাট খুলে নিজ মাথা বইটির উপর রেখে হৃদয় নির্যাষ নিংড়িয়ে চোখ বুজে এক ধ্যানে অতি একীনের সাথে বিগলিত চিত্তে বললাম, হে খোদা! জীবনে অনেক বই পুস্তক কিতাব-পত্র পত্রিকা পড়লাম। কম বেশী অনেক অনেক লিখলাম, কিন্তু এমন লিখাতো আর কোন দিন পাই নি, পড়িও নি। এই গ্রন্থকার এত তত্ত্ব-ও তথ্যপূর্ণ কথা লিখার পরও খোদার কসম খেয়ে বলেছেন, হে বন্ধুগণ! আমার জীবন যাঁর কাছে সংরক্ষিত তাঁর কসম, খোদা আমাকে ওহী ইলহাম করে যা বলছে আমি তাই-ই বলছি এবং আমিই সেই ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ যার আসার কথা ছিল ঠিক সেই সময় মতই আমি এসেছি। তাঁর এই আবেগ-আপ্লুত কথা আমিও মেনে নিয়ে বললাম, "হে খোদা তোমার কসম! আমি বিশ্বাস করলাম, তিনি তোমার প্রেরিত মা'মুর। অতএব, দয়া করে চশমা ছাড়া পড়ার তৌফীক এবং চোখের রশ্মি আমাকে দান কর।" এই কথা শেষ করে এখান হতে বাসায় ফিরলাম সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে। হাত মুখ ধূয়ে কার্তিক মাসের ম্যাজ ম্যাজ শীতে মুড়ি চা পান করতে করতে বিদ্যুৎ না থাকায় শুইয়ে বইটি হাতে নিয়ে লণ্ঠনের আগুনে বইটি ঐ একীনের সাথে পড়তে চেষ্টা করলাম হঠাৎ দেখি যে, আমি যেন বালক হয়ে গিয়েছি। চশ্মা ছাড়া পড়তে পারছি। কি বলব এই আনন্দের কথা স্ত্রীকে ডেকে বললাম। সে-ও অবাক হতবাক হয়ে গেল। আমি মাগরিবের নামায পড়ে অসীমভাবে দোয়া করে শুকরিয়া আদায় করলাম খোদার দরবারে।

এরপর মারাত্মক ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হলাম আমি ১৯৮৯ সনে। মানুষের ভীর লেগেছে আমাকে দেখার জন্য। ঔষধ ক্রীয়া করছে না। মরি মরি অবস্থায় ৪ দিন চলে গেল। পঞ্চম দিনগত রাত গভীরে অর্থাৎ রাত দেড়টা / ২টার সময় স্বপ্নে দেখি সাদা পায়জামা, সাদা পাগড়ি এবং কালো শেরোয়ানী পরিহিত ও একটি বেত হাতে এক বুযূর্গ আমার বাড়ীর টিনের গেট ধাক্কা দিয়ে খুলে অতি ব্যস্ততার সঙ্গে আমার ঘরের খোলা দরজা দিয়ে ঢুকেই আমার শিয়রে বসে বললেন, ভাই ! আমি বড় ব্যস্ত। আপনার এ কঠিন অসুখের কথা শুনে আস্‌ছি আপনাকে আশ্বস্ত করতে যে, আপনি ইন্‌শাআল্লাহ্ মরবেন না, সুস্থ হবেন। বলেই হাতের ডানা মেলে উঠানে গিয়ে উড়াল দিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেলেন। আমি জাগ্রত হয়ে স্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। পরদিন সুস্থ হয়ে গেলাম। ডাক্তারেরা এবং সবাই জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। স্বপ্নে যাকে দেখলাম এই লোককে আমি কোন দিন দেখি নি পূর্বে। তবে তিনি যে, ইমাম মাহ্দী (আঃ) এই পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন। সময় বইয়ে চলল। গোষ্ঠির ৪০/৪২ জন জবরদস্ত মওলানার কথা ভেবে এবং পরিণতি চিন্তা করে ঢাকায় আসলাম অনেকের সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। আমার আহমদীয়তের উপর বন্ধুবর কাইজার মিঞা, বর্তমানে ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী আমার সঙ্গে তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ আলাপ আলোচনা করে নেন। পরেও অনেক আলোচনা করে আবেগ দিয়ে বললেন, "রাধন! তোমাকে সরাইল বি,বাড়ীয়ার একজন উমর (রাঃ) হিসাবে পেতে চাই। আমি আরবী লাইনে উম্মী মানুষ তথাপি তাঁর এই কথাটি আমার মনের গভীরের এলবামে স্থান করে নিল। একদিন কুমিল্লা বারের বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সবার সঙ্গে আলোচনা করে কুমিল্লা নন্দনপুরে ৩০শে ডিসেম্বর বোধ করি শুক্রবার দিন জনাব ডাঃ করিম সাহেবের বাড়ীতে কুমিল্লার জাঙ্গালিয়ায় বসবাসকারী এবং কুমিল্লা জেলার আহমদীয়তের বিশিষ্ট নেক বান্দা জনাব ইদ্রিস সাহেবের মাধ্যমে খোদার কৃপায় ১৯৯৪ সনে ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর জামাতে দাখিল হবার সৌভাগ্য হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ্। এর পরে নিজস্ব পড়াশুনা কুরআন হাদীসের উপর চালিয়ে যেতে থাকি। মরহুম মীর সিকান্দর আলী সাহেবের বয়াতের পর প্রায় একশ' বছর পূর্বে যেমন আলোড়ন ও হৈ চৈ লাগে আমি খাকসারের বয়াতের পর একই অবস্থা নতুন করে ঘটে। ৯০ বৎসর পর খোদার মেহের বাণীতে আমার পরে সরাইল থানার বিভিন্ন এলাকার প্রায় শতাধিক লোক বয়াত নিয়েছে, তন্মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজন হ'ল ঃ আলহাজ্জ রফিকুল ইসলাম (হারিছ), কাজী নজরুল ইসলাম (মলাই), হাফেয আব্দুল হান্নান, মৌঃ হাবিবুর রহমান, মৌঃ সালাহ উদ্দিন আহমদ, জনাব লাল মিঞা, মোঃ তাজুল ইসলাম, মীর সাক্কার আলী, মোঃ জাহের আলী, সর্দার আবুল হাশেম, মোঃ হাফিজ বেপারী ও মৌঃ হাফেজ বশির উদ্দীন প্রমুখ। এই সমস্ত নেক লোকগুলিকে আখেরী যমানার ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর জামাতে দাখিল হবার বরকত ও কল্যাণের কারণে এ বৎসর ২৩শে মার্চ-২০০১ শুক্রবার সরাইল জামাতের এক আড়ম্বর-পূর্ণ সীরাতুন্নবী জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর উপস্থিতি ছিল অভূতপূর্ব অনন্য সাধারণ এবং কল্পনাতীত। কমবেশী বিরোধিতার মধ্যে লোক সমাগম হয়েছে প্রায় ১১/১২শ' আল্লাহ্ চাহেত কোন কিছুর ঘাট্‌তি পড়ে নি। জনগণের মধ্যে প্রতিক্রিয়াও হয়েছে যথেষ্ট। আমরা সমস্ত ভাই-বোনের পক্ষ হতে দোয়া প্রার্থী।

- ওয়াহিদ হোসেন রাধন

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD

**CONCORD CONDOMINIUM LTD.**

CONCORD CENTRE 43,NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর খাবার পরিবেশনে অনন্য

**ধানসিঁড়ি রেস্তোরাঁ**

রোড # ৪৫-৪৬ # ৩২এ গুলশান, ঢাকা-১২১২

ফোন ঃ ৯৮৮২১২৫, ৮৮২৫০৫০

**সূচনা রেন্ট-এ-কার**

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

**সালমান**

অস্থায়ী অফিস ঃ

৬৭৬/৩২ ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা

ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

পাক্ষিক আহমদীর অব্যাহত অগ্রযাত্রায় আমাদের অভিনন্দন

**PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.**

**AIR-RAIFI & CO.**

120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217

Phone : 414550, 9331306

New Vol. No. 63 ❑ 22nd Issue May 31, 2001 ❑ Tk. 10.00

Fortnightly **The AHMADI** রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

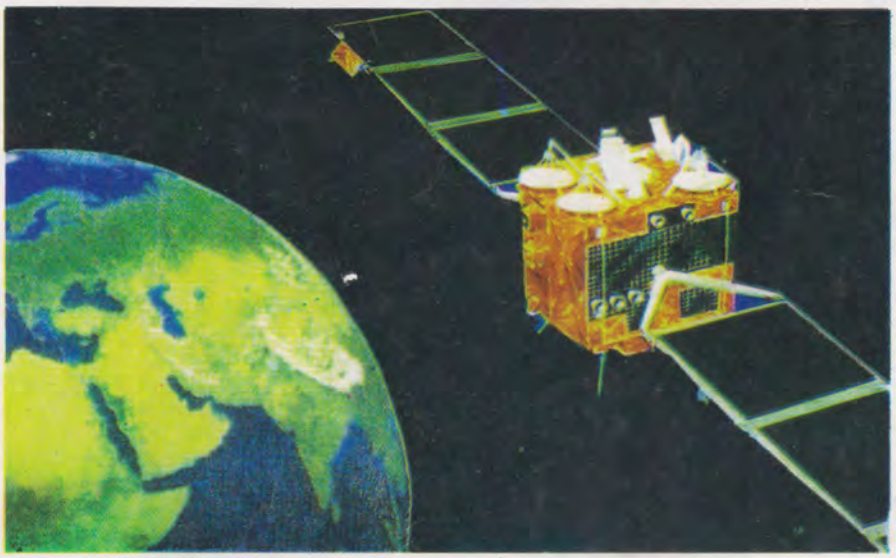

لا اله الا الله محمد رسول الله

# Muslim TV AHMADIYYA International

## এমটিএ MTA-এর দর্শকদের জন্য সুখবর!

এমটিএ **MTA** আন্তর্জাতিক স্যাটালাইট টেলিভিশন প্রযুক্তি আর উৎকর্ষের পথে আর এক ধাপ এগিয়ে গেছে। এশিয়ার দর্শকদের জন্য গত ১৩ই মার্চ, ২০০১ থেকে এম টি এ ডিজিটাল সম্প্রচার আরম্ভ করেছে (আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌)। এর পাশাপাশি এনালগ সম্প্রচার আগের মতই আগামী কয়েকমাস চালু থাকবে। তাই দর্শকদের কাছে ডিজিটাল সিস্টেমে যাবার জন্য যথেষ্ট সময় হাতে আছে। সংশ্লিষ্ট সকলকে এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। DIGITAL সম্প্রচার ধারণ করতে আপনার কেবল একটি নতুন DIGITAL RECIEVER SET লাগবে। DISH আর LNB অপরিবর্তীত থাকবে। নতুন RECIEVER-এর মূল্য প্রায় এগার হাজার টাকা পড়বে।

আকাশে এমটিএ-এর নতুন ঠিকানা ঃ

MTA INTERNATIONAL (DIGITAL)
SATTELLITE : ASIASAT 2
POSITION : $100.5^0$ EAST
SYMBOL RATE : 27500
DOWN LINK FREQ : 3660 MHZ
POLARITY : VERTICAL
PID : AUTO & OTHER NOS.
FEC : 3/4

ডিজিটালে দশ ফিট ডিশে অত্যন্ত স্বচ্ছ আর স্পষ্ট ছবি ও শব্দ ধারণ করা যায়। একই FREQUENCY -তে সউদী টিভি চ্যানেল 'ওয়ান' ধরা হয়। সমস্ত কেবল টিভি ব্যবসায়ীরা এই স্যাটেলাইট ধরে থাকেন।

### MTA AUDIO CHANNELS

| | | |
|---|---|---|
| * Main | : | 6.50 MHz |
| * English | : | 7.02 MHz |
| * Arabic | : | 7.20 MHz |
| * Bangla | : | 7.38 MHz |
| * French | : | 7.56 MHz |
| * German | : | 7.74 MHz |
| * Indonesian | : | 7.92 MHz |
| * Turkee | : | 8.10 MHz |

MTA-তে প্রত্যেক মঙ্গলবার হুযূর (আইঃ)-এর প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষাভাষী দর্শক - শ্রোতাদের নিকট প্রশ্ন আহবান করা যাচ্ছে। নিম্ন ঠিকানায় প্রশ্ন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

*প্রতিটি ঘরে এমটিএ-এর সংযোগ নিন এবং নিয়মিত অনুষ্ঠান মালা দেখুন। পরিবারকে অবক্ষয় মুক্ত রাখুন।*

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

**আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ**

৪ বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন ঃ ৭৩০০৮০৮, ৭৩০০৮৪৯ ফ্যাক্স ঃ ৭৩০০৯২৫
ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 7300808, 7300849 Fax : 7300925